বিশ্বের বিজ্ঞানী

অমরনাথ রায়

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র, ১৩৬৮
অগস্ট, ১৯৬১
প্রকাশ করেছেন
নমিতা চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২
ছেপেছেন
পঞ্চানন চক্রবর্তী
মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৬

স্নেহের
শ্রীমান বিবেক
ও
স্বাতী

আজ যারা তোমাদের মতো কিশোর-কিশোরী—তাদের সবার জন্যেই রচনা করেছি, এই গ্রন্থ 'বিশ্বের বিজ্ঞানী'। তোমাদের সবার উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম আমার এই সাহিত্য কর্ম।

অমরনাথ রায়

বিশ্বের বিজ্ঞানী

এই লেখকের আরও কয়েকটি বই :

দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী

রসায়ন ভারতী

স্যার রোনাল্ড রস

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে রইবে, 'স্যার রোনাল্ড রস' তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ম্যালেরিয়া রোগের কারণ অনুসন্ধান এবং সেই রোগ দমন সম্ভব হয়েছে স্যার রোনাল্ড রসের গবেষণায়।

ডক্টর রসকে আমরা আপনজন বলে মনে করি। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবন কেটেছিল আমাদের এই ভারতবর্ষেই। ভারতের মাটিতে বসেই তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে সফলকাম হয়েছিলেন।

তাঁর কর্মময় জীবন কাহিনী আমাদের কর্মে অনুপ্রাণিত করবে —এই জীবনী-গ্রন্থ চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্যার রোনাল্ড রস।

॥ এক ॥

একালের মানুষ 'ম্যালেরিয়া' রোগকে পরোয়া করে না। কারণ মানুষ এখন জানে—এ রোগ কি কারণে হয় এবং হলে কি তার চিকিৎসা। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন মানুষ এ রোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তখনকার দিনে লাখে লাখে মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতো—মারাও যেতো অসংখ্য।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক্। এ দেশের কতো গ্রাম যে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। এখনও এ রোগটি যে আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে—এমন কথা বলা যায় না।

যে মানুষটি আজীবন সাধনা ক'রে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ ও সেই রোগ দমনের উপায় উদ্ভাবন করেন, তাঁর নাম 'স্যার রোনাল্ড রস'। রস জাতিতে ইংরাজ। তাঁর বাবা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন।

উত্তর ভারতের কুমায়ুন পাহাড়ের আলমোড়া শহরে স্যার রোনাল্ড রস-এর জন্ম হয়। জন্মকাল ১৮৫৭ সালের ১৩ই মে।

রোনাল্ড ছিলেন তাঁর বাপ-মায়ের প্রথম সন্তান।

রোনাল্ডের শৈশবকাল ভারতেই কাটে। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি একবার দারুণভাবে আমাশা রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগে ভুগে ভুগে খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। লেখাপড়া শুরু করতেও দেরি হয়।

ছেলের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, স্বাস্থ্যের কারণে লেখাপড়া শুরু করতেও দেরি হচ্ছে দেখে তাঁর মা-বাবা খুব চিন্তিত হন। অবশেষে ১৮৬৫ সালে বালক রোনাল্ডকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে ওয়াইট দ্বীপে রোনাল্ড তাঁর কাকা-কাকীমার কাছে মানুষ হতে থাকেন।

বেশ বুদ্ধিমান ছেলে রোনাল্ড। স্মৃতিশক্তিও ভাল। ন'বছরের ছেলে এই বয়সেই গড়গড়িয়ে শেক্সপীয়রের অনেক কবিতাই আবৃত্তি করতে পারতেন। ইংরেজী লেখার কায়দাও বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছিলেন। গান-বাজনা ভালবাসতেন। আর ভালবাসতেন ছবি আঁকতে।

ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃতি বিজ্ঞান রোনাল্ডের প্রিয় পাঠ্য বিষয় ছিল। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ করতে বড় ভাল লাগতো তাঁর। গরমের দেশের প্রাণী, বিশেষ ক'রে গিরগিটি আর হরেক রকম সাপ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষ কৌতূহলী।

রোনাল্ডের কাকা ছিলেন চিকিৎসক। এক বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানীতে তিনি চাকরি করতেন। জাহাজে ক'রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতেন। ভাইপো রোনাল্ডকে তিনি বিদেশ থেকে আনা একটা জ্যান্ত বহুরূপী (গিরগিটি জাতীয় প্রাণী) উপহার দিয়েছিলেন। ভারী মজার প্রাণী এই বহুরূপী। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বহুরূপী ইচ্ছামতো যখন তখন গায়ের রঙ বদলাতে পারে।

কাকার কাছ থেকে জ্যান্ত বহুরূপীটি উপহার পেয়ে বালক রোনাল্ড তো খুব খুশী। বাড়ির সামনের বাগানে কাচের 'গ্রীণ-হাউস' বানিয়ে রোনাল্ড বহুরূপীটিকে তার মধ্যে রেখে দিলেন।

শীতকালে শীতপ্রধান দেশে বাগানের খোলা জায়গায় গাছপালা বাঁচে না কিন্তু গ্রীণ-হাউসের মধ্যে সেই গাছপালা রাখলে সেগুলি গরম আবহাওয়ায় দিব্যি বেঁচে থাকে। গরম জলের নলের সাহায্যে রোনাল্ডদের গ্রীণ-হাউসটিকে শীতকালে গরম রাখা হতো।

মাছি, মথ ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ধ'রে রোনাল্ড গ্রীণ-হাউসের মধ্যে ছেড়ে দিতেন। বহুরূপী সেগুলি মনের আনন্দে ধ'রে টপাটপ খেতো। পোষা প্রাণীটির হাব-ভাব, চাল-চলন লক্ষ্য করতে বড় ভাল লাগতো রোনাল্ডের। তাঁর অবসর বিনোদনের সাথী ছিল ঐ বহুরূপীটি।

বাগান পরিচর্যা করতো এক মালি। মালির একদিন কি বদ-খেয়াল হলো কে জানে। তখন শীতকাল। জল বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা। মালি একদিন গ্রীণ-হাউসে ঢুকে মজা দেখার জন্যে জলের ঝারি থেকে সেই কনকনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল বহুরূপীর গায়ে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অবলা প্রাণীটি অসাড় হ'য়ে মরে গেল। রোনাল্ড মালির এই অমানবিক আচরণে মর্মাহত হলেন। মালির ওপর তিনি দারুণ রেগে গেলেন। সেইদিন থেকে মালি হলো রোনাল্ডের শত্রু। রোনাল্ড প্রতিজ্ঞা করলেন—মালিকে তিনি ক্ষমা করবেন না কোনদিন।

১৮৬৯ সাল।

রোনাল্ডের বয়েস তখন বারো বছর। সাউদাম্পটন শহরের কাছে 'স্প্রিংহিল' নামক একটি বোর্ডিং স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হলো। স্কুলে লম্বা ছুটি থাকলে রোনাল্ড চ'লে আসতেন কাকার বাড়ি ওয়াইট দ্বীপে। চার বছর লেখাপড়া বেশ ভালই হলো ঐ বোর্ডিং স্কুলে।

১৮৭৩ সালে রোনাল্ডের বাবা-মা তাঁদের অন্যান্য সন্তানদের নিয়ে

ছুবছরের জন্যে ছুটি কাটাতে এলেন স্বদেশে। আপনজনদের কাছে পেয়ে রোনাল্ড তখন খুব খুশী হলেন। বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটে তিনি দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জন্মস্থান ভারতবর্ষের অনেক গল্প শুনতে লাগলেন। সে দেশের মানুষ, পশুপাখি, বনজঙ্গল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বতের গল্প শুনতে শুনতে মোহিত হ'য়ে গেলেন রোনাল্ড।

দেখতে দেখতে জীবনের সতেরটি বছর কেটে গেল। স্কুলের পাঠ শেষ হলো। রোনাল্ড চাইলেন কবি বা চিত্রশিল্পী হতে কিংবা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু তাঁর বাবার তাতে অমত। তিনি চান—ছেলে ডাক্তারি পাস ক'রে তাঁরই মতো ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিক।

শেষে বাপের ইচ্ছাই পূরণ হলো। রোনাল্ড ডাক্তারি পড়তে রাজী হলেন। ১৮৭৪ সালে তিনি লণ্ডনের সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়বার জন্যে ভর্তি হলেন।

ডাক্তারি পড়ার প্রথম বছর মোটেই ভাল লাগলো না রোনাল্ডের। শারীর বিজ্ঞানকে ভালভাবে বুঝবার জন্যে মানুষ ও অনেক প্রাণীর মৃতদেহ কাটাকুটি করতে হতো। প্রকৃতি-প্রেমিক ছেলের স্পর্শকাতর মন প্রাণীদেহ কাটা ছেঁড়ায় ব্যথা পেতো। কিন্তু চিকিৎসা বিদ্যা শিখতে হলে শারীর বিদ্যাকে তো বাদ দেবার উপায় নেই। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ ক'রে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেই হতো রোনাল্ডকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও মন ছিল তাঁর শিল্পীসুলভ। পড়াশুনা ও হাসপাতালে কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই তরুণ রোনাল্ড হয় কবিতার বই পড়তেন, নয়তো আপন মনে বসে ছবি আঁকতেন।

ছাত্রাবস্থায় সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালেই রোনাল্ড জীবনে

প্রথম ম্যালেরিয়া রোগী দেখেন। এতদিন তিনি এই রোগটির নামই শুনে এসেছিলেন। এখন সেই রোগগ্রস্ত মানুষকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ এলো।

ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল হলো যুবক রোনাল্ডের। রোগীকে তিনি খুঁটিয়ে নাটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। নানারকম প্রশ্ন ক'রে জানতে লাগলেন—তার কি কি উপসর্গ। পরীক্ষা ও প্রশ্নবাণে জর্জরিত রোগী ভয় পেয়ে হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে গেল। —ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের প্রথম সুযোগটি হাতছাড়া হ'য়ে গেল রোনাল্ডের।

এরপর তাঁকে ছ'মাসের জন্যে ট্রেনিং নিতে যেতে হলো 'স্রুসবেরি ইন্‌ফারমারি'তে। সেখানে লর্ড লিস্টার-এর ছাত্র ডক্টর কলিন্সের সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো। সেটা ১৮৭৭ সাল।

ডক্টর কলিন্স তাঁর শিক্ষাগুরু লর্ড লিস্টার প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করলেন স্রুসবেরি হাসপাতালে। হাসপাতাল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে এবং জীবাণুনাশক ওষুধ 'কার্বলিক অ্যাসিড' ছড়িয়ে দিয়ে ডক্টর কলিন্স অনেক রোগ সংক্রমণ বন্ধ করতে সক্ষম হলেন।

ডক্টর কলিন্সের কাছ থেকে রোনাল্ড অনেক শিক্ষা পেলেন। পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রেখে জীবাণুনাশক ওষুধ প্রয়োগ করলে অনেক রোগের সংক্রমণই রোধ করা যায়—লর্ড লিস্টারের এই তত্ত্বের সত্যতা উপলব্ধি করলেন রস এখানে এসে।

মেডিক্যাল কলেজের পড়াশুনায় ফাঁকি দেওয়ার জন্যে রোনাল্ড ফাইন্যাল পরীক্ষায় একবার অকৃতকার্য হলেন। পরের বার ১৮৮১ সালে তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করলেন এবং ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিলেন। সে বছর ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজ-যোগে তিনি ভারত অভিমুখে রওনা হলেন। এক মাস পরে পৌঁছুলেন বোম্বাই বন্দরে।

॥ দুই ॥

রস বোম্বাই থেকে ট্রেনযোগে চলে এলেন মাদ্রাজে। উঠলেন একটি হোটেলে। নাম 'ডেণ্টস্ গার্ডেন হোটেল'। কর্মস্থল সেণ্ট জর্জ দুর্গের নিকটবর্তী সামরিক হাসপাতাল। এই হাসপাতাল কেবলমাত্র ব্রিটিশ সৈন্যদের চিকিৎসার জন্যে তখন সংরক্ষিত ছিল।

এ হাসপাতালে কাজ কম। দিনে দুই-তিন ঘণ্টার কাজ। তারপর অফুরন্ত অবসর। অবসর সময়টা রস পড়াশুনা ক'রে কাটাতে লাগলেন। হিন্দী ভাষা শিখে নিয়ে একটা পরীক্ষাতেও পাস করলেন। তারপর ইটালীয়ান, ফ্রেন্চ ও জার্মান ভাষাও শিখতে লাগলেন। উদ্দেশ্য—ঐ সব ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থগুলির রস আস্বাদন করা। শুধু কাব্য চর্চার উদ্দেশ্যে ভাষা শিক্ষাই নয়, নিজেও কিছু কবিতা লিখতে লাগলেন। তার কিছু কিছু প্রকাশিতও হলো পরবর্তী কালে।

পরের বছর ডক্টর রসকে বদলী করা হলো মহীশূরের সামরিক হাসপাতালে। মহীশূর ও বাঙ্গালোরের জলহাওয়া খুবই ভাল লাগলো তাঁর। কিন্তু বেশীদিন তিনি এখানে থাকতে পারলেন না।

ক'হপ্তা বাদে আবার বদলী হলেন ভিজিয়ানাগ্রামে।

ভিজিয়ানাগ্রামে এসে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে রস পরিচিত হলেন। সাধারণ শ্রেণীর মানুষ থেকে আরম্ভ ক'রে দেশীয় রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশলেন। এঁদের জীবনযাত্রা প্রণালী ভালভাবে লক্ষ্য করলেন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব হলো। কাজের মাঝে অবসর পেলেই এই সব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে টেনিস খেলে ও শিকারে গিয়ে দিব্যি সময় কাটাতে লাগলেন। চিকিৎসাবৃত্তি তখনও তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি। পারে নি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে।

১৮৮২ সালের শীতকাল।

ডক্টর রস আবার বদলী হলেন মাদ্রাজে। তবে মাদ্রাজ শহরে নয়; শহরের উপকণ্ঠে পাল্লাভরমে। এখানকার ছোট হাসপাতালটিতেও তিনি কিছু ম্যালেরিয়া রোগীকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেলেন।

পাল্লাভরমে কিছুদিন কাজ করার পর তাঁকে এক বছরের জন্যে পাঠানো হলো বাঙ্গালোরে। তারপর সেখান থেকে কোয়েটায়।

ডক্টর রস ভারতের যেখানেই যান, সেখানেই মশা আর ম্যালেরিয়া রোগ। কোথাও কম, কোথাও বা বেশী। কোয়েটায় মশা বেশী, ম্যালেরিয়া রোগও বেশী। সেখানকার সামরিক হাসপাতালের অর্ধেক রোগীই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে।

কোয়েটা থেকে মাদ্রাজে ফিরে রসকে এবার যেতে হলো ব্রহ্মদেশের মৌলমিনে। মৌলমিনের হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগীদের চিকিৎসা ক'রে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করলেন। কিন্তু সেখানেও বেশীদিন থাকতে পারলেন না। ১৮৮৬ সালে তাঁকে পাঠানো হলো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে।

আন্দামানে এসে প্রচুর অবসর পেলেন রস। তিনি সেই সময়ের

সদ্ব্যবহার করলেন একখানি উপন্যাস লিখে। কয়েক বছর পরে সেই উপন্যাসখানি প্রকাশিতও হলো।

অনেক জায়গায় বদলী হওয়ার পর ১৮৮৭ সালে ডক্টর রস আবার ফিরে এলেন মাদ্রাজে। দেখতে দেখতে চাকরি জীবনের প্রথম ছ'টি বছর গেলো কেটে। দেশে বেড়াতে যাবার জন্যে ছুটি প্রার্থনা করলেন রস। ছুটি মঞ্জুর হলো। ১৮৮৮ সালের জুন মাসে ছুটি কাটাতে তিনি ইংলণ্ড রওনা হলেন।

ছুটিতে রস দু'বছর রইলেন ইংলণ্ডে। ছুটির বছর দু'টি তিনি কিন্তু শুয়ে-বসে বা বেড়িয়ে কাটালেন না। পড়াশুনা ক'রে জন-স্বাস্থ্যের উপর ডিপ্লোমা লাভ করলেন। রস মনে করলেন—তাঁর এই বিষয়ের জ্ঞান ভারতের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়ক হবে। এই জ্ঞান তিনি ভারতবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নয়নে প্রয়োগ করতে পারবেন।

ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কখ্-এর আবিষ্কারের কাহিনী শুনেছিলেন রস। এই দুই বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছিলেন যে জীবাণু থেকেই রোগের উৎপত্তি হয়। রোগ উৎপত্তির এই তত্ত্ব তরুণ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডক্টর রসের মনে গভীরভাবে রেখা-পাত করেছিল।

তখনও পর্যন্ত মানুষ জানতো না—কিভাবে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি হয়। তখনকার দিনের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে জলাভূমির দূষিত বায়ু সেবনই ম্যালেরিয়া রোগ উৎপত্তির কারণ।

লুই পাস্তুর ও রবার্ট কখ্-এর আবিষ্কারের কাহিনী শোনার পর ডক্টর রস-এর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে ম্যালেরিয়া রোগটাও নিশ্চয়ই জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। অজানা সেই জীবাণুদের খুঁজে বের করার ব্রত গ্রহণ করলেন ডক্টর রোনাল্ড রস।

দু'বছরের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এলো। রস ছুটির মধ্যেই বিয়ে করলেন। তারপর নববধূকে নিয়ে ভারতে ফিরে এলেন ১৮৯০

সালে। বাঙ্গালোরের সামরিক হাসপাতালে কাজে যোগ দিলেন।

পরের বছর ক'দিনের ছুটিতে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন রস।

ফিরবার পথে 'মেট্রুপালাইয়ম' নামে এক জায়গায় মাছ ধরবার জন্যে রাত কাটালেন। ঘাটের ধারে এক কুটীরে ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দারুণ মশা সেই জায়গায়। রস মশারি টাঙ্গিয়ে শুলেন রাতে। কিন্তু তাঁর বন্ধু 'টেইট' বিনা মশারিতেই রাত কাটালেন।—এর কিছুকাল পরে 'টেইট' ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন কিন্তু রস-এর কিছুই হলো না।

এই ঘটনা থেকে রস-এর সন্দেহ হলো—ম্যালেরিয়া কি তাহলে মশা কামড়ালে হয়! এতদিন অবশ্য কেউই মশাকে ম্যালেরিয়া রোগের বাহক হিসাবে সন্দেহ করেন নি।

এমন সময় 'লাভেরান' নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে প্রকাশ পেলো যে, রক্তে পরজীবীর উপস্থিতির জন্যেই ম্যালেরিয়া রোগটা হয়। 'স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন' নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীও এই সময় রসকে একদিন বললেন যে –সম্ভবতঃ মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে। রস নিজের মতেরই সমর্থন পেলেন স্যার প্যাট্রিক ম্যানসনের কাছে। তখনই তিনি স্থির ক'রে ফেললেন যে—পরীক্ষার দ্বারা এর সত্যতা তিনি যাচাই ক'রে দেখবেন।

এবার ম্যালেরিয়া রোগ উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হলেন রস। প্রচুর পড়াশুনা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের সাধনায় মগ্ন হয়ে ম্যালেরিয়া রোগের উপর একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। সেই প্রবন্ধ লেখার জন্যে ১৮৯৫ সালে তিনি 'পার্কেস মেমোরিয়াল স্বর্ণ পদক' লাভ করলেন।

সেই বছরই রস তাঁর শিশুপুত্র ও দুই কন্যাসহ স্ত্রীকে ইংলণ্ডে রেখে এসে ভারতে বসে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

॥ তিন ॥

তখনকার দিনে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা বলতে শুধু কুইনিনই ছিল। 'সিনকোনা' নামক উদ্ভিদের ছাল থেকে তৈরি হয় 'কুইনিন'।

স্পেন দেশীয় মহিলা 'কাউন্টেস অফ সিনকন' দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাসের সময় ঘন ঘন ম্যালেরিয়া রোগে ভুগতেন। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা তাঁকে সিনকোনা গাছের ছাল থেকে প্রস্তুত আরক খাইয়ে রোগমুক্ত করে। কাউন্টেস সিনকোনার উপযোগিতা বুঝতে পেরে ঐ উদ্ভিদের কিছু চারা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে নিয়ে আসেন। সেটা ১৬৪০ সাল। তখন থেকেই ইউরোপে সিনকোনার চাষ শুরু হয়। তারপর এই উদ্ভিদের ছাল থেকেই আবিষ্কৃত হয় একটি উপক্ষার—নাম যার 'কুইনিন'।

ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী লাভেরান-এর কথা আগেই বলেছি। ইনিও ছিলেন ফরাসী সামরিক বাহিনীর চিকিৎসক। কাজ করতেন উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়ায়।

একদিন এক ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের নমুনা সংগ্রহ

ক'রে তা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে পরীক্ষা করার সময় লাভেরান লক্ষ্য করলেন যে, সেই রক্তে কিছু অপরিচিত জীবাণু রয়েছে। লাভেরান সুস্থ মানুষের রক্তে ঐ জীবাণুগুলিকে দেখতে পেলেন না। তখন তাঁর ধারণা হলো যে, ঐ জীবাণুগুলি নিশ্চয়ই কোনভাবে সুস্থ মানুষের রক্তে মিশে রোগ সংক্রমণ ঘটিয়েছে। অতএব অপরিচিত ঐ জীবাণুগুলি নিশ্চয়ই পরজীবী শ্রেণীর এবং রক্তেই ওদের বাস।

লাভেরান আরও কয়েকটি রোগের পরজীবীদের চিনতেন। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে পাওয়া পরজীবীরা সম্পূর্ণ নতুন ব'লে মনে হলো তাঁর কাছে। অন্যান্য রোগের পরজীবীদের সঙ্গে তাদের আকৃতিগত কোন মিলই নেই। লাভেরান আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। ম্যালেরিয়ার পরজীবীরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আকৃতি পরিবর্তন করে। বরাবর একই আকৃতি নিয়ে থাকে না।

এখন প্রশ্ন হলো—মানুষের রক্তস্রোতে এই পরজীবীরা আসে কি ক'রে?—কিছু কিছু পতঙ্গের দংশনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদেহে রোগ সংক্রামিত হয়, এ সত্য তখন মানুষের জানা ছিল। অতএব কোন পতঙ্গের দংশনে মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত হলেও হতে পারে। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ডক্টর রস-এর দৃঢ় প্রত্যয় হলো যে মশাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। কিন্তু এটা তো প্রমাণ করা দরকার।—এখন সেই কাজেই মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন তিনি।

ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই রস ঘুরলেন। এ দেশের সর্বত্রই মশা। বাঙ্গালোরেও মশা প্রচুর অথচ ওখানে ম্যালেরিয়া রোগ নেই।—এ ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে রস-এর ধারণা হলো যে সব জাতের মশা হয়তো ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে না। তাহলে কোন্ জাতের মশা আসল অপরাধী?—সেইটা খুঁজে বের করাই প্রথম কর্তব্য বলে মনে করলেন তিনি। তারপর প্রশ্ন আসবে—কিভাবে

ম্যালেরিয়ার পরজীবী মশার দেহে বংশবৃদ্ধি করে। এ দু'টি প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পেলেই সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে—ম্যালেরিয়া রোগের কারণ জানা যাবে। আর কারণ জানা গেলে রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময় করাও সহজসাধ্য হবে।

হাসপাতালে রুটিন মাফিক কাজ সেরে অবসর সময়ে মশা আর মাইক্রোস্কোপ নিয়ে পরীক্ষা কার্যে মেতে উঠলেন ডক্টর রস। দৈনিক কম ক'রে আট ঘণ্টা মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজ করতে লাগলেন।

রস তখন সেকেন্দ্রাবাদে। সেখানে তিনি দু'জাতের মশার সন্ধান পেলেন। এক রকম মশা বাদামী রঙের। আর এক রকম মশার দেহে বাদামীর ওপর অন্য রঙের ছিটে ফোঁটা দাগ।

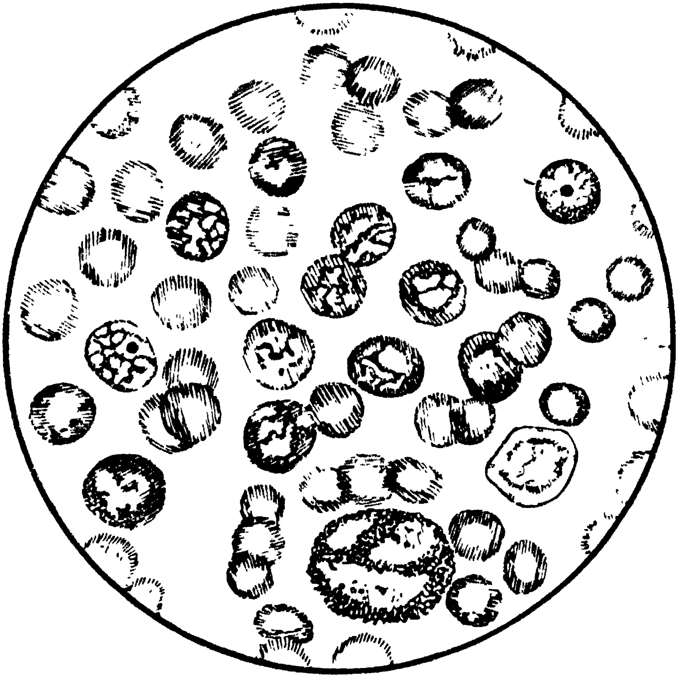
রস এই দু'জাতের মশা ধ'রে একটি কাঁচের বোতলে পুরে রাখলেন। হাসপাতালে গিয়ে ম্যালেরিয়া রোগীদের মশারির মধ্যে বোতলের মশাগুলিকে ছেড়ে দিলেন। মশাগুলি পেট ভ'রে ম্যালেরিয়া রোগীদের রক্ত চুষে খেলো। তারপর রস মশারির মধ্যে থেকে সাবধানে ঐ মশাগুলিকে ধ'রে আনলেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঐ মশাগুলির এক একটির দেহ ব্যবচ্ছেদ ক'রে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

এ সব কাজেও বাধা ছিল অনেক। প্রথমতঃ, অনেক রোগী এ-ভাবে মশার কামড় খেতে চাইতো না। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষার জন্যে রক্ত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আঙুলে ছুঁচ ফোটাতে দিতে রাজী হতো না অনেক রোগী। তৃতীয়তঃ, রক্ত পান করার পর অনেক মশা ফুলে উঠতো এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় আনতে আনতেই মরে যেতো।

এসব ক্ষেত্রে রস টাকা ঘুষ দিয়ে অনেক সময় রোগীকে বশ করতেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ঘুষের লোভ দেখিয়েও কাজ হতো না। বেয়াড়া রোগী ডাক্তারের কথায় কান দিত না।

যাই হোক্ পরীক্ষা শুরু করার মাস খানেকের মধ্যেই রস কয়েকটি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারলেন। তার মধ্যে একটি হলো—ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পান করার পর মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু তিন-তিনবার অবস্থা পরিবর্তন করে।



ম্যালেরিয়ার জীবাণুযুক্ত রক্তকোষ

রস ভাবতে লাগলেন—মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর আরও একটি অবস্থা, অর্থাৎ কিনা চতুর্থ অবস্থা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। সেটা হওয়া উচিত 'ডিম্বাণু' অবস্থা। পরজীবী এই অবস্থাতেই সুস্থ মানুষের দেহে রোগ সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হয়।—ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে পরজীবীর ডিম্বাণু অবস্থা আগেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন রস, কিন্তু মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর সেই ডিম্বাণু অবস্থার সন্ধান তখনও তিনি পান নি।

ডক্টর রস-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যখন এমনিভাবে সমস্যাসমাধানের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন কিন্তু তখনও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই আছেন। তাঁর বিশ্বাস—মশার দেহজাত পরজীবীরা জলকে দূষিত করে। আর সেই দূষিত জল পান করেই সুস্থ মানুষ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়।

এদিকে রস চিন্তা করতে লাগলেন—মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর 'ডিম্বাণু' অবস্থা কেন পাওয়া যাচ্ছে না? তবে কি—যে দু'জাতের মশা নিয়ে এতদিন পরীক্ষা করা হচ্ছিল, তারা কি সুস্থ মানুষের দেহে রোগ সংক্রমণে অক্ষম? এদের পাকস্থলীতে কি তাহলে পরজীবীর চূড়ান্ত অবস্থান্তর ঘটে না? তবে কি—ঠিক জাতের মশার সন্ধান পাওয়া যায় নি?

॥ চার ॥

১৮৯৭ সাল।

মার্চ মাস।

বেশ গরম পড়েছে।

রস সপরিবারে ছুটি কাটাতে গেলেন নীলগিরি পাহাড়ের শৈল-শহর উটকামণ্ডে।

উটকামণ্ড শহরটি সাগরতল থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু। এখানে ম্যালেরিয়া রোগ হয় না, কিন্তু উটকামণ্ড যাবার মাঝপথে দু'হাজার থেকে চার হাজার ফুট উচ্চতায় 'সিগুর ঘাটে' ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ খুব বেশী।

রস সিগুর ঘাটে গেলেন কিছু অনুসন্ধান কার্য চালাতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে ক'দিনের মধ্যেই দারুণভাবে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। রোগাক্রান্ত হবার আগে তিনি সিগুর ঘাটে এক নতুন ধরনের মশার সন্ধান পেলেন। ঐ মশার ছোট ছোট ডানা-গুলিতে ফোঁটা ফোঁটা দাগ থাকে, আর ওরা দেওয়ালের গায়ে বসবার সময় লেজটি উপর দিকে তুলে রাখে।

রস-এর ধারণা হলো—এই জাতের মশারাই হয়তো ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। কিন্তু অসুস্থ থাকায় তিনি ঐ মশাদের নিয়ে তখনই কোন পরীক্ষা কার্য চালাতে পারলেন না। নিশ্চিত হতে পারলেন না—তাঁর অনুমান সত্যি কিনা।

ছুটি শেষ হলে পর রস সপরিবারে ফিরে এলেন তাঁর কর্মস্থল সেকেন্দ্রাবাদে। সেখানে এসে নীলগিরি পাহাড়ের সিগুর ঘাটে দেখা নতুন ধরনের মশার সন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু খুঁজে পেলেন না একটিও। রস কিন্তু তাতে মোটেই নিরাশ হলেন না।

ক্রমে বর্ষা এলো।

খাল-বিল, নদী-নালা-গর্তগুলি ভ'রে গেলো বর্ষার জলে। মশার দল আবদ্ধ জলে লাখে লাখে ডিম পাড়তে লাগলো। ডিম ফুটে কিছুদিনের মধ্যেই লার্ভা বা শূককীট বেরুলো। রস তখন চারদিকে লোক পাঠালেন মশার শূককীট বোতলে ভ'রে আনতে।

মশা এবং মশার শূককীট সংগ্রহ করার জন্যে রস যেসব লোক নিয়োগ করেছিলেন তাদের বলা হতো 'মসকুইটো ম্যান'। ঐ মসকুইটো ম্যানেরা পথের ধারের খানা-খন্দের কর্দমাক্ত জল থেকে অজস্র শূককীট বোতলে ভ'রে নিয়ে এলো। রস ঐ বোতলগুলি সযত্নে তুলে রাখতে বললেন তাদের। অধীর আগ্রহে তারপর তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন– কখন ঐ শূককীটগুলি থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা বেরোয়—তা দেখবার জন্যে।

এর কয়েকদিন পরের ঘটনা।

সকালে রস তাঁর ঘরে বসে চা-জলখাবার খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই ঘরের দেওয়ালে একটি মশাকে বসে থাকতে দেখলেন। খুব ভালভাবে তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন মশাটিকে।—হ্যাঁ, এই জাতের মশা-ই তো দেখেছিলেন নীলগিরি পাহাড়ের সিগুর ঘাটে। ছোট

ছোট ফুট্‌কি রয়েছে ডানায়। লেজটি উপর দিকে তুলে দেওয়ালের গায়ে দিব্যি বসে রয়েছে।

জলখাবার ফেলে রেখে রস সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন সেই দেওয়ালের দিকে। কৌশলে ও সাবধানে মশাটি ধ'রে একটি বোতলে পুরে রাখলেন। তারপর বোতলে তামাকের ধোঁয়া ভ'রে মশাটিকে মেরে ফেলে মসকুইটো ম্যানদের দেখালেন। মসকুইটো ম্যানেরা খুব ভালভাবে মরা মশাটিকে উলটিয়ে পালটিয়ে লক্ষ্য ক'রে চিনে নিলো। তারপর তারা ঐ মশার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো দিকে দিকে, কিন্তু সেকেন্দ্রাবাদের কোথাও অমন মশা একটিও খুঁজে পেলো না। রস নিরাশ হলেন।

আবার কয়েকদিন পরের ঘটনা।

মসকুইটো ম্যানদের একজন ছুটে এসে চমকপ্রদ এক আনন্দ সংবাদ শোনালো ডক্টর রসকে। বোতলে ভ'রে যে শূককীটগুলি রাখা হয়েছিল তার থেকে প্রায় ডজনখানেক পূর্ণাঙ্গ মশা বেরিয়েছে। আর সেই পূর্ণাঙ্গ মশার প্রত্যেকটিই নতুন জাতের ফোঁটা কাটা ডানাযুক্ত মশা—যেমনটি দেখা গিয়েছিল নীলগিরি পাহাড়ের সিগুর ঘাটে।

এ সংবাদে রস আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলেন। এতদিনের অনুসন্ধান এবার তাহলে সার্থক হলো, ভাবলেন তিনি।

সামরিক হাসপাতালে সেদিন এক নতুন ম্যালেরিয়া রোগী এলো। নাম তার হুসেন খাঁ। রস তার মশারির মধ্যে নতুন জাতের মশাগুলিকে ছেড়ে দিলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গোটা দশেক মশা হোসেন খাঁর রক্ত পান ক'রে ফুলে উঠলো।

রস তখন ঐ মশাগুলিকে সাবধানে ধ'রে একটি একটি ক'রে

বোতলে পুরে ফেললেন।

হুসেন খাঁকে এর জন্যে মশা পিছু ছ'পয়সা ক'রে ঘুষ দিতে হলো। কথা ছিল—হুসেন খাঁ নড়াচড়া না ক'রে নীরবে মশার কামড় খাবে। অস্বস্তি বা কষ্টবোধ করলেও কোন মশাকে মারবে না।—হুসেন খাঁ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করায় প্রতিশ্রুত অর্থ পেলো।

এ ঘটনা ১৮৯৭ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখের।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় রস ঐ দশটি মশার মধ্যে দু'টির পাকস্থলী কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে পরীক্ষা করলেন। পরের দিন আরও দু'টি মশা কেটে পরীক্ষা করলেন।—এর একদিন পরে অর্থাৎ ১৯শে আগস্ট তারিখে রস দেখলেন যে অবশিষ্ট আটটি মশার মধ্যে দু'টি মারা গেছে।

মরা মশা নিয়ে পরীক্ষা ক'রে তো কোন লাভ নেই। রস তাই সেদিন আরও দু'টি মশা কেটে পরীক্ষা করলেন।—দেখলেন যে মশা দু'টির পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর আকৃতিগত কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

পরের দিন অর্থাৎ ২০শে আগস্ট আর একটি মশার পাকস্থলীতে রস ম্যালেরিয়া পরজীবীর ডিম্বাণু অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন।—একুশটি গোলাকার কোষ। প্রতিটি কোষের মধ্যে আবার ডজনখানেক ক'রে অতি ক্ষুদ্র কালো ডট্ চিহ্ন।

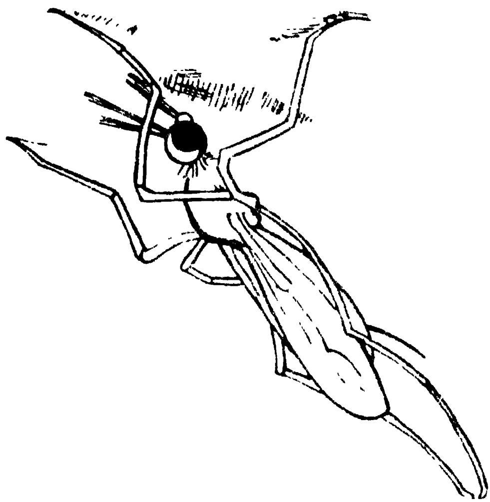
এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'রে রস আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলেন। তাঁর বহু প্রত্যাশিত অনুমান আজ সত্য ব'লে প্রমাণিত হলো। এক অজানা রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হলো সেদিন।

পরীক্ষাধীন দশটি মশার মধ্যে আর একটি মাত্র মশা অবশিষ্ট ছিল। হুসেন খাঁর রক্ত পানের পঞ্চম দিনে রস সেটিকে কেটে তার পাকস্থলীতে কালো ডট্ চিহ্ন যুক্ত একুশটি কোষই দেখতে পেলেন। তবে এই কোষগুলি আগের দিনে দেখা কোষের চেয়ে আকারে

একটু বড়, এই মাত্র।

রস বুঝলেন যে মশার পাকস্থলীতে থেকে গত চব্বিশ ঘন্টায় কোষগুলি একটুখানি বেড়েছে। রস-এর এই পরীক্ষা থেকেই প্রমাণিত হলো যে মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার পরজীবীদের চার রকম অবস্থান্তর ঘটে ও তারা একটু একটু ক'রে বড় হয়।

রস এই শেষোক্ত জাতের মশাদের নাম রাখলেন 'এনোফিলিস'। এরাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। এরপর আরও পরীক্ষা চালিয়ে রস প্রমাণ করলেন যে, এনোফিলিস মশার পাকস্থলী থেকে লালাগ্রন্থির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার পরজীবীরা মশার মুখে আসে।



এনোফিলিস মশা

তারপর সেই মশা যখন কোন সুস্থ মানুষকে দংশন করে তখন ঐ পরজীবীরা সুস্থ মানুষের দেহের রক্তস্রোতে মিশে যায় ও তার দেহে রোগ সংক্রামিত করে।

এসব ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ দেবো শেষ অধ্যায়ে। এখন শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ডক্টর রোনাল্ড রস-এর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার মানবজাতিকে এক মারাত্মক রোগের কবল থেকে বাঁচাবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হলো। রস নতুন এক জ্ঞানের রাজ্যে এসে উপনীত হলেন।

॥ পাঁচ ॥

১৮৯৮ সালে কলকাতায় পাখিদের ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে গবেষণা করার পর ডক্টর রস পরজীবীদের জন্ম, জীবন ও কার্যকলাপের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করলেন। এর চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করার পর ১৮৯৯ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

মশার প্রজনন ও বংশবিস্তার রোধ করতে পারলে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পৃথিবীর এক বিরাট অংশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে পারা যাবে—অন্যান্যদের এই কথা উপলব্ধি করানোর চেষ্টায় রস তাঁর বাকি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করবেন ব'লে স্থির করলেন।

দেশে ফিরে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে বোঝালেন যে, ব্রিটিশ রাজত্বের সর্বত্র 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন' স্থাপন করা প্রয়োজন। এই স্কুলগুলিতে চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা লাভ করবে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগসমূহের উৎপত্তির কারণ ও তা নিরাময়ের উপায় নিয়ে গবেষণা

চালানো হবে সেখানে।

ব্রিটিশ সরকার ডক্টর রস-এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ১৮৯৯ সালেই লিভারপুলে প্রথম স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হলো। লিভারপুল বন্দরে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অনেক নাবিক ও যাত্রী অসুস্থ অবস্থায় এসে পৌছুতো। তাদের ভর্তি করা হতো এই হাসপাতালে। ফলে এখানকার ছাত্ররা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পীতজ্বর, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ পেতো।

লিভারপুলের স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে অধ্যাপনা ও গবেষণা করার জন্যে আহ্বান জানানো হলো ডক্টর রসকে। তিনি সে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। কিন্তু নতুন পদে যোগদানের আগে তিনি ফরাসী দেশে 'পাস্তুর ইনস্টিট্যুট' পরিদর্শনে গেলেন। সেখানে মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর আবিষ্কর্তা ডক্টর লাভেরান-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাত হলো। লাভেরান ও তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে ব্যাকটিরিয়া ও প্রাণীজ পরজীবী সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ ক'রে রস ফিরে এলেন লিভারপুলে। গ্রহণ করলেন অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ।

১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে রস ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে রওনা হলেন 'সিয়ারা লিওন'। 'সিয়ারা লিওন' আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী একটি ব্রিটিশ কলোনি। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জায়গা। এই জায়গাটিকে 'শ্বেতাঙ্গদের কবরখানা' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা অর্থাৎ পশ্চিম আফ্রিকাবাসীরা এখানে বাস করতে করতে স্থানীয় রোগগুলির আক্রমণ প্রতিহত করার স্বাভাবিক শক্তি অর্জন করেছিল। ফলে এই 'কালা আদমীরা' সহসা এসব রোগে আক্রান্ত হতো না। হলেও রোগের প্রাবল্য থাকতো কম। কিন্তু ঠাণ্ডার দেশ থেকে এসে শ্বেতাঙ্গরা গ্রীষ্মপ্রধান

দেশের রোগগুলির দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হতো। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর প্রভৃতি রোগে ভুগে বহু শ্বেতাঙ্গ মারা যেতো। তাই সিয়ারা লিওনকে তখন 'শ্বেতাঙ্গদের কবরখানা' আখ্যা দেওয়া হতো।

ডক্টর রস সিয়ারা লিওন-এর রাজধানী ফ্রি-টাউনে গিয়ে শুরু করলেন অনুসন্ধান কার্য। দেখলেন যে, জায়গাটি মশক সংকুল। পথের দু'পাশে নালা-নর্দমার জল নিকাশের ব্যবস্থা নেই। শহরের মাঝে এখানে সেখানে খানা ডোবা, কোথাও বা পরিত্যক্ত কুয়া। এই সব জায়গার আবদ্ধ জলে মশারা ডিম পাড়ে। শহরের সামরিক হাসপাতালটি ম্যালেরিয়া রোগীতে ভর্তি। হাসপাতালের দেওয়ালে এনোফিলিস মশা ঝাঁকে ঝাঁকে ব'সে থাকে। রস কয়েকটি মশাকে কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে তাদের পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার পরজীবী দেখতে পেলেন।

তখনই তিনি ইংলণ্ডে একখানি টেলিগ্রাম পাঠালেন। তাতে লিখলেন: "সিয়ারা লিওনে ম্যালেরিয়া রোগের বাহক মশার সন্ধান পাওয়া গেছে। সত্বর সাহায্য পাঠান।"

পরের দিন এই টেলিগ্রামখানির বিষয়বস্তু ইংলণ্ডের খবরের কাগজগুলিতে বেশ ফলাও ক'রে ছাপা হলো।

ব্রিটেনের জনসাধারণ ঐ টেলিগ্রামখানি প'ড়ে বেশ মজা অনুভব করলো। এর আগে তারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করেছে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দুর্গত মানুষকে সাহায্য করেছে। কিন্তু মশা মারার জন্যে সাহায্য - এ এক অভিনব ব্যাপার! তাই ব্রিটিশরা দরাজ হাতে সাহায্য পাঠাতে লাগলো।

ইংলণ্ড থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য এলো। মশা মারায় অভিজ্ঞ কিছু লোকও এলো সিয়ারা লিওনে। ডক্টর রস শুরু করলেন মশক নিধন অভিযান। মশা ডিম পাড়ে যে সব জলাভূমিতে, সেগুলি সাধ্যমতো বুঁজিয়ে ফেলা হলো। নালা-নর্দমার আবদ্ধ জল

নিকাশের ব্যবস্থা করা হলো। পুকুরে, খালে, বিলে কেরোসিন তেল ছড়িয়ে দিয়ে মশার লার্ভা বা শূককীট মারার ব্যবস্থা করা হলো। এ ভিন্ন হাসপাতাল, অফিস, কাছারি প্রভৃতির জানালায় সরু তারের জালি লাগিয়ে দেওয়া হলো। সিয়ারা লিওনের অধিবাসীদের নির্দেশ দেওয়া হলো: "নিজ নিজ বাড়ির আশেপাশে জল জমতে দেবেন না, নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখবেন, রাতে মশারি টাঙ্গিয়ে শোবেন।"

এ সব উপদেশ কিন্তু কেউই কানে তুললো না। স্থানীয় লোকদের ধারণা—পৃথিবীর বুক থেকে মশা নির্মূল করা যায় না। অতএব এই সব উপদেশ পালন করাই বৃথা।

রস লিভারপুলে ফিরে এলেন। সিয়ারা লিওনে তাঁর আরদ্ধ কাজ স্থানীয় অধিবাসীদের অসহযোগিতার জন্যে নিষ্ফল হয়েছে জেনে তিনি মর্মাহত হলেন।

এর দু'বছর বাদে ডক্টর রস আবার ফ্রি-টাউনে গেলেন। গিয়ে দেখলেন—অবস্থা 'যথা পূর্বম্ তথা পরম্'। শহরের মাঝে এখনও এখানে ওখানে নোংরা জল আবদ্ধ হ'য়ে আছে। খানা-ডোবাগুলির জলে মশার শূককীট কিলবিল করছে। সূর্য অস্ত গেলেই ঘরে ঘরে মশার গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিন্দুমাত্র কমেনি।

রস ভাবলেন—সাধারণ মানুষকে ম্যালেরিয়া রোগের কারণটা ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, তবে যদি তাদের চৈতন্যোদয় হয়। —এই ভেবে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিয়ারা লিওনে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখিয়ে বোঝাতে লাগলেন—ম্যালেরিয়া রোগ কিভাবে সৃষ্টি হয়। মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার পর-জীবীদের আকৃতিগত পরিবর্তন কি ভাবে হয়, তার ছবিও দেখাতে লাগলেন ডক্টর রস। কিন্তু লোকে তা বিশ্বাস করলো না। ছবি

দেখে তারা অবিশ্বাসের হাসি হাসলো। ডক্টর রসকে ঠাট্টা করতে লাগলো।—নিরাশ হলেও রস কিন্তু হাল ছাড়লেন না।

নব উদ্যমে আবার কাজে নামলেন রস। ব্রিটেন বাসীদের দানের টাকার অঙ্কটা বেশ মোটাই ছিল। স্বদেশ থেকে আনা একদল সুদক্ষ কর্মীও তাঁর নির্দেশ পালনের জন্যে তৈরি ছিল। সেই টাকা ও কর্মীদের সাহায্যে রস আবার কাজে নামলেন। পচা জলভরা খানা-খন্দগুলি বোঁজাতে লাগলেন। গৃহস্থের বাড়ির আনাচে-কানাচে যে সব ভাঙ্গা পাত্র ছিল—সেগুলো সংগ্রহ ক'রে গুঁড়িয়ে ফেললেন, যাতে বর্ষার জল তাতে জমতে না পারে। তাছাড়া অগভীর জলাশয়গুলিতে এবং নালা-নর্দমার আবদ্ধ জলে কেরোসিন তেল ছড়িয়ে দিতে লাগলেন।

মশার বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে অবশেষে আংশিক জয়ী হলেন রস। সেবার সিয়ারা লিওনের রাজধানী ফ্রি-টাউনে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ একটু কমলো। ওখান থেকে চ'লে আসার আগে রস তাঁর এক বন্ধুকে সেখানে রেখে এলেন। রসের অনুপস্থিতিতে মশার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের অধিনায়করূপে কাজ করতে লাগলেন তিনিই।

ভাল কাজের পুরস্কার মেলেই। ডক্টর রসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। ১৯১১ সালে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হলেন। তখন থেকেই তিনি পরিচিত হলেন 'স্যার রোনাল্ড রস' নামে। ঐ বছরেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন রস। ম্যালেরিয়ার কারণ নির্ণয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার পেলেন তিনি।

'ডিনামাইট' নামক প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থের আবিষ্কর্তা সুইডিশ কোটিপতি আলফ্রেড নোবেল-এর সঞ্চিত অর্থ থেকে প্রতি বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে

বিশ্বের সেরা ব্যক্তিদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়। 'নোবেল পুরস্কার' বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কাররূপে স্বীকৃত।

স্যার রোনাল্ড রস তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে গিয়ে সুইডেনের রাজার হাত থেকে 'নোবেল পুরস্কার' গ্রহণ করলেন। আজীবন বিজ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেলেন তিনি।

সে দিনটা ছিল ১৯১১ সালের ১০ই ডিসেম্বর। রসকে সেদিন একটি সুন্দর পদক ও সেই সঙ্গে ৭৮০০ পাউণ্ডের একখানি চেক পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হলো। তাঁর পরিচয় প্রদান উপলক্ষে বলা হলো—ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তি ও বিস্তারের প্রকৃত কারণ নির্ণয় ক'রে স্যার রোনাল্ড রস মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এ একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। আর এই আবিষ্কারের জন্যেই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলো জগদ্বিখ্যাত এই নোবেল পুরস্কার।

পুরস্কারটা বড় কথা নয়। তাঁর সাধনা, তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি পেলো—এতেই খুশী হলেন রস। আরও খুশী হলেন এই ভেবে যে—তাঁর আবিষ্কারে মানবসমাজ এক মারাত্মক ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পাবে।

ছয়

বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার 'ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্‌স'-এর তত্ত্বাবধানে ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল খনন সম্পূর্ণ হয়। খালটির খননকার্য সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে পুরো দশটি বছর।

সুয়েজখাল খনন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের এক বিরাট কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরকে সংযুক্ত করেছে এই খাল। এর মধ্যে দিয়ে জাহাজ গেলে ইউরোপ থেকে দূরপ্রাচ্যে পৌঁছুতে মাত্র ২।৩ সপ্তাহ সময় লাগে। কিন্তু এই খাল খননের আগে জাহাজগুলিকে আফ্রিকার উপকূল ঘুরে যেতে হতো। ফলে ইউরোপ থেকে দূরপ্রাচ্যে যাতায়াত করতে এর দ্বিগুণ বেশী সময় লাগতো।

মিশরের বালুকাময় মরু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সুয়েজ খাল কাটা হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের পোর্ট সৈয়দ থেকে শুরু ক'রে এই খাল গিয়ে পৌঁছেছে সুয়েজ উপসাগরের পোর্ট টেফিকে। দু'টি সাগরকে যোগ করার ফলে সুয়েজ খালের জলও লোনা।

এই সুয়েজ খালের ধারে ১৮৭৫ সালে 'ইসমাইলিয়া' নামে একটি শহর গড়ে ওঠে। কিন্তু সুয়েজের জল লোনা বলে এই শহরের

বাসিন্দাদের কাছে পানীয় জলের সমস্যাটি বড় হয়ে দেখা দেয়।

মিশরের নীল নদ বেশী দূরে নয়। তার জল কিন্তু মিঠা। তাই পানীয় জল সমস্যা সমাধানকল্পে স্থির হয় যে, নীল নদ থেকে খাল কেটে মিঠা জল নিয়ে আসা হবে ইসমাইলিয়া শহরে।

খাল কাটাও হলো। কিন্তু তার ফলে আর এক সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দিল। মশা ও ম্যালেরিয়া রোগের ডিপোতে পরিণত হলো শহরটি।

লোনা জলে মশা ডিম পাড়ে না। ডিম পাড়ে মিঠা জলে। তাই যতদিন ইসমাইলিয়া শহরে সুয়েজখালই একমাত্র জলাশয় ছিল, ততদিন মশা ছিল না—ম্যালেরিয়াও ছিল না। কিন্তু মিঠা জলের খাল কাটা মাত্রই ঐ খালের পার্শ্ববর্তী খানা-ডোবার আবদ্ধ জলে মশা ডিম পাড়তে লাগলো।

১৮৭৭ সালে ইসমাইলিয়া শহরে প্রথম ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটলো। সে বছর ঐ শহরে তিনশো লোক আক্রান্ত হয়েছিল ম্যালেরিয়ায়। তারপর প্রতি বছর ঐ রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ১৯০০ সালে ঐ সংখ্যা বেড়ে ২২৮৪তে পৌঁছুলো। বহু লোক ম্যালেরিয়ার কবলে প'ড়ে প্রাণ হারালো। বেগতিক দেখে প্রস্তাব উঠলো—নতুন কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় শহরকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক্।

এমন সময় ইসমাইলিয়া শহরের অবস্থা আয়ত্তে আনতে স্থানীয় সরকার স্যার রোনাল্ড রসের শরণাপন্ন হলেন।

ডক্টর রস গেলেন ইসমাইলিয়া শহরে। গিয়ে দেখলেন—শহরটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে কি হবে. মিঠা জলের খালের দু'ধারে অজস্র খানা-খন্দ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে জল আটকে রয়েছে! সেই আবদ্ধ জলে মশারা ডিম পেড়ে অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি ক'রে চলেছে। রস ঐ সব খানা-খন্দের জলে এনোফিলিস মশার অগণিত

শূককীট বা লার্ভা কিলবিল ক'রে ঘুরে বেড়াতে দেখলেন। এ ভিন্ন আরও একটা খারাপ জিনিস নজরে পড়লো তাঁর।– শহরের প্রতিটি বাড়ির নালা-নর্দমার জল ঐ সব বাড়ি-সংলগ্ন একটি আবদ্ধ গর্তে গিয়ে পড়ে। গর্তগুলির মুখে ঢাকনা লাগানো থাকে। বায়ু চলাচলের জন্য গর্তের থেকে ঢাকনা ভেদ ক'রে একটি লম্বা নল উপরে উঠে গেছে। মশারা ঐ নলের ভেতর দিয়ে গর্তে ঢুকে সেখানকার জলে ডিম পেড়ে আবার ঐ নল বেয়েই বাইরে বেরিয়ে আসে। গর্তের জলে ডিম ফুটে প্রথমে শূককীট জন্মায় ও পরে তার থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা জন্মে ঐ নল বেয়ে বাইরে চ'লে আসে। ছড়িয়ে পড়ে গৃহস্থের ঘরের আনাচে কানাচে।

রস মশার ডিম পাড়ার সম্ভাব্য সকল জায়গাতেই সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ক'রে কেরোসিন তেল ছড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলেন ইংলণ্ডে। ইসমাইলিয়া শহরের সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ ডক্টর রস-এর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলো। তার ফলে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ অনেক ক'মে গেলো। ১৯০৬ সালে ইসমাইলিয়া শহর সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়া রোগমুক্ত হলো।

ম্যাডাগাস্কার থেকে ৫৫০ মাইল দূরে ভারত মহাসাগরে একটি সুন্দর দ্বীপ—মরিসাস। সিয়ারা লিওন থেকে কয়েকজন ম্যালেরিয়া রোগী ১৮৬৬ সালে এই দ্বীপে বেড়াতে আসে। আর সেই বছরই মরিসাসে প্রথম ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দেয়।

এর পরবর্তী চল্লিশ বছরে মরিসাসে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুর হার শতকরা চল্লিশ ভাগ বেড়ে যায়। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী আখ চাষী অথবা ক্ষেত শ্রমিক। এরা ম্যালেরিয়ায় ভোগার দরুন মরিসাসে আখ চাষের দারুণ ক্ষতি হতে লাগলো। দেশের অর্থনীতি পড়লো বিপর্যস্ত হ'য়ে।

তখন এই দ্বীপে ডাক পড়লো ডক্টর রসের। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে রস গেলেন মরিসাসে। তিনি সেখানকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের বুঝিয়ে দিলেন—ম্যালেরিয়া রোগ কিভাবে সংক্রামিত হয় এবং সেই রোগ-সংক্রমণ দমন করতে হলে কি কি করা দরকার।

ডক্টর রসের নির্দেশে মরিসাসে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হলো। তার ফলে ধীরে ধীরে দ্বীপটি ম্যালেরিয়ার কবল থেকে মুক্তি পেল।

এমনিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেলো যে, ম্যালেরিয়া রোগ দমন করতে হলে সর্বাগ্রে আগে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা দরকার। ডক্টর রসের লেখা 'দ্য প্রিভেনশন অফ ম্যালেরিয়া' (ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ) নামে একখানি বই এই সময় প্রকাশিত হলো। ডক্টর রসকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ম্যালেরিয়া রোগ বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। বিশ্বের যে দেশে যখনই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, সে দেশ থেকে তখনই ডক্টর রসের ডাক পড়ে।

'ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ' বইখানি টেকনিক্যাল ধরনের বই, তবুও তাতে পাকা সাহিত্যিকের হাতের স্পর্শ উপলব্ধি করা যায়। কাব্য রচনাতেও ডক্টর রসের খ্যাতি ছিল। বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করার ফলে তিনি সেই ক্ষমতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। ভারতে বসবাস করার সময় যে কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন তার কয়েকটির মধ্যে রোগ প্রপীড়িত মানুষের দুর্গতির প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ও চিকিৎসকের অসহায় মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। 'ভারতের জ্বর' নামক একটি কবিতায় তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এই বলে : যে অদৃশ্য, ক্ষুদ্র শক্তি কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করছে, তার স্বরূপ তিনি যেন তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটন করেন।

মরিসাসের পর 'পানামা'।

পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ একফালি সরু ভূখণ্ড মধ্য-আমেরিকার মেক্সিকোকে দক্ষিণ-আমেরিকা উপমহাদেশের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ঐ ভূখণ্ডের নাম 'পানামা'। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পানামা ছিল বণিকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থলপথ। এই পথেই স্পেনীয় বণিকেরা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করতে যেতো।

কিন্তু যতই দিন গেলো, 'পানামা' ততই এক ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হতে লাগলো। ধনী বণিকদের এই সুন্দর বাণিজ্য কেন্দ্রটি কালক্রমে মানুষের 'মৃত্যুফাঁদ' রূপে পরিগণিত হলো। সেখানকার স্যাঁতসেঁতে জমির ঘন জঙ্গলগুলি হ'য়ে উঠলো মশক সংকুল। সেখানে মশার যেমন দাপট, তেমনি দাপট ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের। এই দুই রোগের দাপটে স্পেনীয় বণিকদের বসতিগুলি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হলো। প্রায় জনশূন্য হ'য়ে পড়লো এই ভূখণ্ড। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে কেউ তখন আর পানামায় যেতে চাইলো না।

পানামার 'কোলোন' নামক শহরটিতে দশ হাজার পরিবারের বাস ছিল। সেই শহরেই পরে কবর খুঁড়তে হলো দেড়লক্ষ মানুষের। এদের মৃত্যু হয়েছিল ম্যালেরিয়া আর পীতজ্বরে। উভয় রোগেরই বাহক মশা!

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেমন অনেক সুন্দর সুন্দর জনপদ ধ্বংস হ'য়ে গেছে, তেমনি মশার কবলে পড়েও পৃথিবীর বহু জনপদ গেছে ধ্বংস হয়ে। পানামার ধ্বংসের মূলেও ছিল এই মশা।

ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্‌স-এর কথা আগেই বলেছি। 'সুয়েজ খাল' এঁরই তত্ত্বাবধানে খনন করা হয়। আমেরিকান সরকার কয়েকবছর বাদে এঁকে 'পানামা খাল' খনন করার জন্য

আহ্বান জানালেন। 'পানামা' ভূ-খণ্ডের মধ্যে দিয়ে এই খাল প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করবে।

ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্‌স কয়েক হাজার ফরাসী শ্রমিক ও ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে পানামায় যান। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এঁরা সবাই পীতজ্বরের কবলে প'ড়ে প্রাণ হারান। লেসেপ্‌স তখন শূন্যস্থান পূরণের জন্যে আরও হাজার খানেক শ্রমিক আনেন পানামায়। কিন্তু পীতজ্বর তাদেরও গ্রাস করে।

এমনিভাবে লেসেপ্‌স কয়েক বছরে মোট পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করলেন খাল খননের জন্যে। কিন্তু খাল খনন তো হলোই না উপরন্তু অকালে প্রাণ হারালো বেশ কয়েক হাজার শ্রমিক। দশটি বছর বৃথা চেষ্টা চালানোর পর পরাভূত লেসেপ্‌স ফিরে গেলেন স্বদেশে। ভগ্ন হৃদয়ে ১৮৯৪ সালে তিনি মারা গেলেন।

১৯০৪ সাল।

স্যার রোনাণ্ড রস গেলেন পানামায়। সেখানে গিয়ে তিনি ফরাসীদের পরিত্যক্ত মরচে ধরা অনেক যন্ত্রপাতি প'ড়ে থাকতে দেখলেন। তাদের খাল খনন প্রচেষ্টার অনেক নিদর্শনই তাঁর নজরে পড়লো।

এদিকে আমেরিকান সরকার পরাজয় স্বীকার করতে রাজী হলেন না। লেসেপ্‌স-এর বিদায় নেওয়ার পরবর্তী দশ বছরে ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের কারণ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁরা জানতে পারলেন। ডক্টর রসের কাছে জানতে পারলেন যে, লেসেপ্‌স-এর অসাফল্যের মূল কারণ টেকনিক্যাল জ্ঞানের অভাব নয়। অভাব মশাবাহিত দুটি রোগ ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জ্ঞানের অভাব।

—এটা বুঝতে পারার পরই তাঁরা পানামায় মশার বংশ ধ্বংস

করার কাজে হাত লাগালেন। ডক্টর রসও আমেরিকান সরকারকে সেই পরামর্শ দিলেন।

এই কাজ পরিচালনার জন্যে তখন ডক্টর গর্গাসকে আনা হলো পানামায়। তিনি ডক্টর রসের কাছ থেকে যথোপযুক্ত নির্দেশ গ্রহণ ক'রে পানামায় মশক নিধন অভিযান শুরু করলেন পূর্ণ উদ্যমে। বন-জঙ্গল কেটে ফেলে, আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে, খানা-খন্দগুলি বুঁজিয়ে এবং অগভীর জলাশয় ও নালা-নর্দমার জলে কেরোসিন তেল ছড়িয়ে দিয়ে তিনি মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করলেন।

আমেরিকান সরকার তারপর চল্লিশ হাজার শ্রমিক এনে পানামায় খাল খননের প্রচেষ্টা আবার শুরু করলেন। ডক্টর গর্গাসকে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বভার দেওয়া হলো।

গর্গাস মশা নিধনের যাবতীয় পদ্ধতি চালু তো রাখলেনই, উপরন্তু শ্রমিকদের ঘরের প্রতিটি জানালায় সরু তারের জালি আটকে দিলেন। শ্রমিক পরিবারের প্রত্যেকে যাতে মশারি টাঙিয়ে শোয় —সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। শুধু তাই নয়—প্রতিটি শ্রমিককে তিনি সপ্তাহে এক ডোজ ক'রে কুইনিন খাওয়াবারও ব্যবস্থা করলেন। ফল হলো অপ্রত্যাশিত।

শ্রমিক ও ইঞ্জিনীয়ারেরা সবাই সুস্থ রইলো। খাল খননের কাজ চলতে লাগলো পুরোদমে। পাথর কেটে, মাটি কেটে, পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে, বনের মধ্যে দিয়ে খাল কাটার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো।

পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ খালটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান হলো ১৯১৪ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। এই খাল খনন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় বণিকদের ও জাহাজ-মালিকদের প্রচুর আর্থিক সাশ্রয় হলো। ডক্টর রোনাল্ড রসের 'মশক তত্ত্ব' এমনিভাবে আমেরিকানদের পানামা খাল খননে সহায়তা করলো।

সাত

স্যার রোনাল্ড রসের ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সাফল্যের কাহিনী শোনানোর পর ম্যালেরিয়া রোগ, তার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আরও কিছু নতুন তথ্য না জানালে বক্তব্য অসম্পূর্ণ র'য়ে যাবে। তাই এই অধ্যায়ের অবতারণা।

যদি প্রশ্ন করি—ম্যালেরিয়া রোগটি কেমন?

উত্তর হবে—কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী পালাজ্বরই ম্যালেরিয়া রোগের বৈশিষ্ট্য। এই পালাজ্বর আবার পাঁচ রকমের। 'টারসিয়ান ম্যালেরিয়া' হলে প্রতি ৪৮ ঘণ্টা অন্তর পালাজ্বর দেখা দেয়। 'কোয়ার্টান ম্যালেরিয়ায়' প্রতি ৭২ ঘণ্টা অন্তর জ্বর হয়। প্রতিদিন জ্বর আসে 'কুয়োটিডিয়ান ম্যালেরিয়ায়'। এ ভিন্ন আর দু'রকম ম্যালেরিয়া জ্বর আছে। তার মধ্যে 'ম্যালিগ্‌ন্যান্ট টারসিয়ান ম্যালেরিয়া' খুবই মারাত্মক।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু সাধারণভাবে 'প্লাসমোডিয়াম' নামে পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার প্লাসমোডিয়াম বিভিন্ন শ্রেণীর ম্যালেরিয়া জ্বর সৃষ্টি করে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু রোগীর দেহ থেকে বেরিয়ে

সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন জীবের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারলে বেশীক্ষণ বাঁচতে পারে না। তাই এই রোগজীবাণুদের নাম দেওয়া হয়েছে 'প্যারাসাইট' বা পরজীবী। এরা প্রোটিষ্টা নামক এককোষী আনুবীক্ষণিক জীবাণু শ্রেণীভুক্ত।

এই পরজীবীরা কিভাবে মশার দেহে প্রবেশ করে এবং সেখানে গিয়ে তাদের কেমন ধরনের পরিবর্তন হয়—তা বলি।

ম্যালেরিয়া রোগীকে যখন এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশা দংশন করে, তখন পরিণত জীবাণু সমন্বিত কতকগুলি রক্তকণিকা স্ত্রী-মশার পাকস্থলীতে ঢুকে পড়ে। সেখানে যাওয়ার পর ঐ রক্তকণিকাগুলি ফেটে গিয়ে 'গ্যামিটোসাইট' নামক পরজীবীরা মুক্তি পায়। এই পরজীবীদের কতকগুলি পুরুষ আর কতকগুলি স্ত্রী।

পুরুষ-গ্যামিটোসাইটের দেহের মধ্যে একটি প্রক্রিয়া ঘটার ফলে তাদের দেহ ফেটে গিয়ে অসংখ্য সরু সরু জীবাণুর সৃষ্টি হয়। এদিকে স্ত্রী-গ্যামিটোসাইটের দেহেও কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে যায়। ফলে স্ত্রী-গ্যামিটোসাইট পরিণত বয়স্ক হ'য়ে ওঠে। এরপর পুরুষ গ্যামিটোসাইট হতে সৃষ্ট জীবাণুগুলির এক একটি স্ত্রী-গ্যামিটোসাইটের দেহে ঢুকে পড়ে।

এইভাবে এদের মিলনের ফলে পুরুষ ও স্ত্রী জীবাণুর কেন্দ্র দুটি একত্রিত হ'য়ে যায়। মিলিত এই জীবদেহের একদিকটা খানিকটা সুঁচালো দেখায়। একে বলা হয় 'উকিনিট'।

উকিনিট ধীরে ধীরে স্ত্রী-মশার পাকস্থলীর দিকে এগিয়ে যায় এবং পাকস্থলী ভেদ ক'রে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সেখানে 'উকিনিট' বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে ডিম্বাকার ধারণ করে। ডিম্বাকার এই পরজীবীর নাম 'উসিস্ট'। 'উসিস্ট' স্ত্রী-মশার পাকস্থলীর বাইরের আবরণের ভেতরের দিকে সংলগ্ন থাকে।

এরপর উসিস্ট সেখানে বেশ বড় সড় হতে থাকে এবং তার মধ্যে

অসংখ্য ছোট ছোট 'স্পোরোজাইট' সৃষ্টি হয়। উসিস্ট ফেটে গেলে পর স্পোরোজাইটরা স্ত্রী-মশার রক্তে মিশে যায়। কিছু সংখ্যক স্পোরোজাইট আবার স্ত্রী-মশার লালাগ্রন্থিতে আশ্রয় নেয়।

এবারে বলি—মশা কিভাবে সুস্থ মানুষের দেহে রোগ সংক্রমণ ঘটায়।

স্ত্রী-মশা যখন কোন সুস্থ লোককে দংশন করে,তখন রক্তচোষবার ঠিক আগের মুহূর্তে কিছুটা লালা সেই লোকের শরীরে ঢেলে দেয়। অমনি বাঁকানো রডের মতো আকৃতিবিশিষ্ট স্পোরোজাইটগুলি সুস্থ মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে ঢুকে পড়ে ও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

যতই দিন যায়, লোহিত কণিকার অধিকাংশ স্থানই এরা দখল করতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রত্যেকটি পরজীবী অর্থাৎ স্পোরোজাইট কয়েকটি অংশে ভাগ হয়ে যায় এবং বিভক্ত অংশগুলি গোলাকার ধারণ করে।

এমনিভাবে রক্তের এক একটি লোহিত কণিকার মধ্যে 'মেরো-জাইট্স' নামে কতকগুলি গোলাকৃতি পরজীবীর সৃষ্টি হয়। এরপর লোহিত কণিকাগুলি আপনা আপনি ফেটে গেলে মেরোজাইট্সগুলি রক্তরসে মিশে যায়। তখন এক রকম বিষাক্ত রস বেরোয়। রক্তে মিশে যাওয়া ঐ বিষাক্ত রসই সুস্থ মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণ ঘটায়—দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি করে। ফলে রোগীর জ্বর হয় ও নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। এ ছাড়া—রক্তের লোহিত কণিকা-গুলি ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ার ফলে এক রকম কালো রঞ্জক পদার্থ সৃষ্টি হ'য়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়। কিছুটা রঞ্জক পদার্থ আবার প্লীহা ও লিভারের উপর জমা হ'য়ে তাদের কালো রঙে রঞ্জিত ক'রে দেয়।

মশা দংশন করার পর থেকে জ্বর আরম্ভ হতে যে সময় লাগে, তা

লোক বিশেষে এবং পরজীবী বিশেষে বিভিন্ন। তবে জ্বর আরম্ভ হতে সাধারণত ১০ থেকে ১৪ দিন সময় লাগে।

আজ থেকে ৩০ কি ৪০ বছর আগেকার কথা বলছি। ম্যালেরিয়ায় ভোগেনি, এমন একজন লোকও আমাদের এই বাংলা দেশে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। এখন অবশ্য অবস্থাটা পাল্টে গেছে।

যাই হোক্, ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগলে রোগীর প্লীহা ও যকৃৎ দুই-ই বেড়ে যায়। রোগীর দেহের মধ্যে পরজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি যদি রোধ করা না যায়, তবে রক্তের লোহিত কণিকাগুলি শীঘ্রই নষ্ট হ'য়ে গিয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু পরজীবীর মৃত্যুর হারও নেহাৎ কম নয়। মানুষের লিভার ও প্লীহার মধ্যে এমন কতকগুলি কোষ থাকে, যারা রক্তের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় বিচরণকারী পরজীবীদের নষ্ট ক'রে দেয়। শুধু তাই নয়, এরা অটুট লোহিত কণিকার মধ্যেকার অপরিপুষ্ট পরজীবীদেরও নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়। এমনিভাবে পরজীবীরাও কিছু সংখ্যায় ধ্বংস হয় বলেই রোগীর দেহের মধ্যেকার সব সুস্থ লোহিত কণিকা সহজে বিনষ্ট হতে পারে না।

ম্যালেরিয়ার পরজীবী পরিণত লোহিত কণিকার চেয়ে অপরিণত লোহিত কণিকাতেই সহজে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। অতএব অধিক রক্তপাতের পর দেহে যখন নতুন রক্তকোষ সৃষ্টি হয়, তখন ম্যালেরিয়ার পরজীবীদের পক্ষে নতুন লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

আবার পরজীবী ধ্বংসের হারের চেয়ে যদি সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী হয়, তবে রোগীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। কিন্তু যদি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে ধ্বংসের হার বেশী হয়, তবে রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে ওঠে।

পরিশেষে ম্যালেরিয়া রোগ দমন ও প্রতিরোধ সম্বন্ধেও কিছু বলা

দরকার। অবশ্য এর অনেক কথাই আগে কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে। যাই হোক্, আজ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগের যত রকম ওষুধ বেরিয়েছে, তাদের মধ্যে কুইনিনই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কুইনিন ছাড়াও অ্যাটাব্রিন, প্লাজমোকুইন প্রভৃতি আরও কয়েকটি ভাল ওষুধ আছে।

রোগ হলে রোগ সারানোর চাইতে রোগ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা ভাল। ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে মশা ধ্বংস করা, মশার প্রজনন বন্ধ করা।

জলাভূমিতে মশা ডিম পাড়ে। জলাভূমিতে কেরোসিন তেল অথবা ডি. ডি. টি. ছড়িয়ে দিলে মশার শূককীটগুলি ম'রে যায়। বাড়ির কাছাকাছি কোথাও পচা ডোবা থাকলে তা বুঁজিয়ে দিতে হয়। ঘরের ভেতরে ও বাইরে নর্দমার জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা করতে হয়। পুকুরের সব রকম আগাছা তুলে ফেলে পুকুর পাড় পরিষ্কার রাখতে হয়। ঘরের জানালাগুলি তারের সরু জাল দিয়ে ঢেকে দিতে পারলে ভাল হয়। পতঙ্গভুক অনেক জলজ উদ্ভিদ আছে যারা মশার শূককীটগুলি খেয়ে ফেলে। যে সব জায়গায় মশা ডিম পাড়ে সেখানে এই জাতীয় উদ্ভিদ রাখা ভাল।

ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে হলে মশার জন্ম নিরোধ করা এবং শৈশব অবস্থাতেই তাদের ধ্বংস করা দরকার। মশা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হলে এ কাজ ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য হ'য়ে পড়ে।

তেচোকা, চেলা, পার্শে, পুঁটি প্রভৃতি অনেক মাছই মশার বাচ্চা খেয়ে ফেলে। কাজেই এই সব মাছ জলাশয়ে রাখলে সেখানে মশার শূককীটগুলি ধ্বংস হ'য়ে যায়।

এমনিভাবে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণ করা সহজসাধ্য হয়।

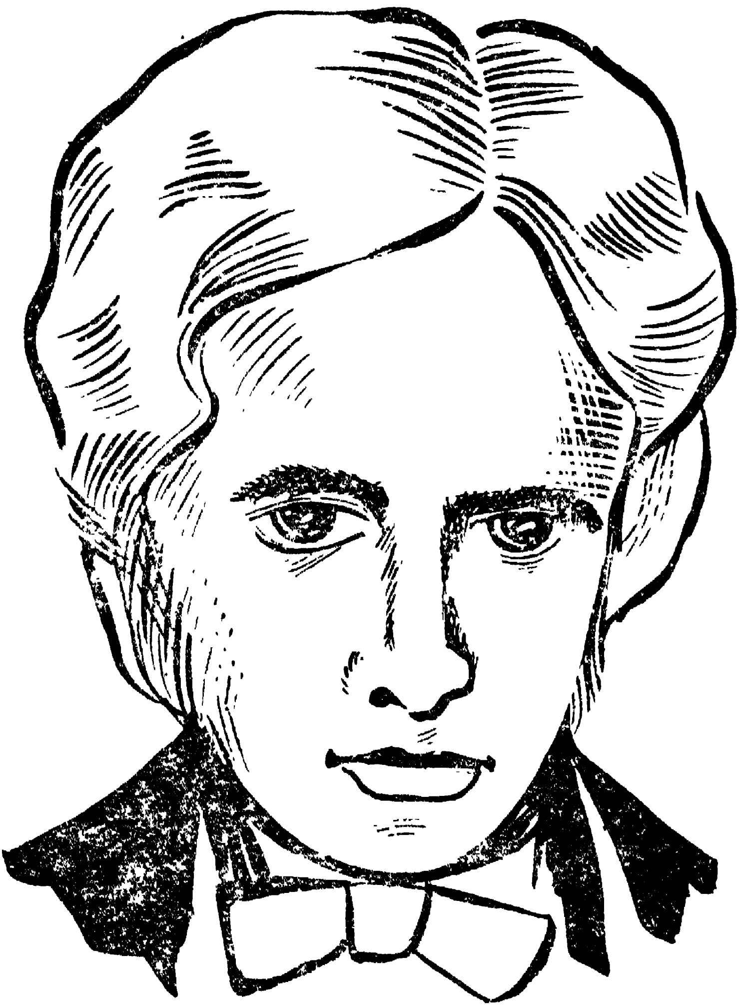
এবারে আবার ফিরে আসি স্যার রোনাল্ড রসের কথায়।

ডক্টর রস ১৯৩২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। নিজের জীবদ্দশায় তিনি তাঁর আবিষ্কারের সুদূরপ্রসারী ফল দেখে যেতে পেরেছিলেন। এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

আজ ডক্টর রস বেঁচে নেই কিন্তু বেঁচে আছে তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব। এই তত্ত্বই বিশ্ববাসীকে জুগিয়েছে 'ম্যালেরিয়া' নামক মারাত্মক রোগটিকে রুখবার হাতিয়ার। তাই স্যার রোনাল্ড রসের কাছে মানব সমাজ চিরঋণী হ'য়ে থাকবে। ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

মাইকেল ফ্যারাডে

"যে শক্তি আমাদের ঘরে ঘরে আলো জ্বালাচ্ছে, শীতের রাতে ঘরকে রাখছে গরম, পাখা চালিয়ে গ্রীষ্মের দিনে আমাদের ক্লান্তি দূর করছে,—ট্রামগাড়ি ও বৈদ্যুতিক ট্রেন চালিয়ে দূরকে করছে নিকট—যার দৌলতে আমরা ঘরে বসে রেডিও শুনছি, সিনেমা ও টেলিভিশনের পর্দায় দেখছি ছবি—সেই শক্তি উৎপাদক যন্ত্র 'ডায়নামো'র আবিষ্কর্তা মাইকেল ফ্যারাডেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ,—১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।"



মাইকেল ফ্যারাডে

এক

যুগে যুগে যে সব মানুষের সাধনায় বিজ্ঞান হয়েছে সমৃদ্ধ, মাইকেল ফ্যারাডে তাঁদেরই একজন।

জাতিতে ইংরাজ এই বিজ্ঞানীর জন্মসূত্রে আভিজাত্য ছিল না, স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাও ছিল না। তাঁর বাবা 'জেমস ফ্যারাডে' ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কশায়ার-এর বাসিন্দা ছিলেন,—পেশায় কামার। বিয়ের পর ইয়র্কশায়ার ছেড়ে প্রথমে তিনি চলে আসেন লণ্ডনের কাছে 'নিউইংটন' নামক এক গ্রামে। পরে সেখান থেকে চলে আসেন লণ্ডনে।

সেকালে ইংলণ্ডে 'স্যাণ্ডিমেনিয়ান্স' নামে এক ধর্মীয় সংস্থা ছিল। ফ্যারাডে পরিবারের সবাই ঐ সংস্থার সভ্য ছিলেন। এঁরা লণ্ডনের এক অখ্যাত বস্তির একটি ঘরে প্রতি রবিবারে উপাসনা করতে যেতেন। পরিবারের বড়রা অবসর সময়ে ধর্ম প্রচার করতেন।

প্রতিভা থাকলে মানুষ স্কুল-কলেজের শিক্ষা না পেয়েও যে বিশ্ববিখ্যাত হতে পারে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ মাইকেল ফ্যারাডে।

১৭৯১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনের কাছে এক গ্রামে এঁর জন্ম হয়। মাইকেল জেমস ফ্যারাডের দ্বিতীয় পুত্র।

ফ্যারাডে পরিবার ছিল খুব গরীব। জেমস ফ্যারাডে নিয়মিত কাজ পেতেন না। তাঁর স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। লণ্ডনে এসে চারটি প্রাণির সংসার চালাতে তিনি হিমসিম খেয়ে যান। জনগণের সাহায্যের উপর তাঁকে তখন কিছুকাল নির্ভর ক'রে থাকতে হয়।

লণ্ডনে ফ্যারাডে পরিবার বাস করতেন বস্তি এলাকায় একটি বাড়ির উপরতলায়। বাড়িটি আসলে ছিল একটি আস্তাবল। জেমস ফ্যারাডের মতো গরীব লোকের পক্ষে লণ্ডন শহরে এর চেয়ে ভাল বাসস্থানের আশা করাটাই অন্যায়।

শৈশবে মাইকেল লণ্ডনের রাস্তায় তাঁর সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলা ক'রে বেড়াতেন। কখনও ঘোড়ার গাড়ির পিছন পিছন ছুটতেন, কখনও সাইকেলের চাকা রাস্তায় গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা করতেন, কখনও বা ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতেন।

তখনকার দিনে লণ্ডন শহরে গরীবের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ তেমন ছিল না বললেই চলে। যা ছিল, তা আজকের দিনে ভাবতেও যেন কেমন লাগে। পোড়ো বাড়ির একখানা বড়সড় অন্ধকার ঘর। আলো-বাতাস কম ঢোকে সে ঘরে। প্রতি রবিবারে গরীবের ছেলেমেয়েরা সেখানে ভিড় করে লেখাপড়া শিখতে। শিক্ষক বা শিক্ষিকারা সেখানে তাদের ধর্মশিক্ষা দেন। শেখান একটু আধটু লিখতে ও পড়তে। ব্যস্ ঐটুকুই। তার বেশী আর কিছু নয়।

কামার জেমস ফ্যারাডেও তাঁর দুই ছেলে—রবার্ট আর মাইকেলকেও পাঠালেন 'রবিবারের স্কুলে'। লেখাপড়ায় মাইকেলের বেশ মন ছিল। বেশ ভালই শিখছিলেন তিনি। কিন্তু নিষ্ঠুর এক শিক্ষকের দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে না পারায় মাইকেলের ছাত্র-

জীবনে ছেদ পড়লো অসময়ে। ইস্কুলের গণ্ডী তিনি আর পার হতে পারলেন না।

জেমস ফ্যারাডে ছিলেন বড় দরের কামার। লোহার অনেক কারুকার্য করা শিল্পদ্রব্য তিনি তাঁর দোকানে বসে তৈরি করতেন। তাছাড়া সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিও মেরামত করতে পারতেন। তাঁর দুই ছেলে—রবার্ট ও মাইকেল আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের বাবার কাজকর্ম লক্ষ্য করতেন। বাপকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন কাজে।

কামারের কাজে মাইকেলের তেমন আগ্রহ না থাকলেও রবার্ট-এর ছিল। রবার্ট তাই বাবার কাছে কামারের কাজ শিখতে লাগলেন। আর মাইকেল?—মাত্র তের বছর বয়েসে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি ভবঘুরে ছেলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

সংসারের অবস্থা ভাল নয়। রুজি-রোজগারের জন্যে মাইকেলের একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কি-ই বা করবেন তিনি। লেখাপড়া তেমন জানা নেই। জানা নেই কোন হাতের কাজও যে একটা চাকরি জুটবে!

লণ্ডনে তখন 'জর্জ রিবাউ' নামে এক পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন। তাঁর আবার বই বাঁধাই করার কারখানাও ছিল। মাত্র তের বছর বয়েসে ভবঘুরে ছেলে মাইকেল জর্জ রিবাউ-এর সুনজরে পড়ে গেলেন। ঐ পুস্তক বিক্রেতার দোকানে মাইকেল একটা সামান্য কাজ পেয়ে গেলেন। কাজটা ছিল—খবরের কাগজ বিলি করা, বাঁধাই-এর জন্যে বই সংগ্রহ করা এবং গ্রাহকদের ঘরে ঘরে গিয়ে বাঁধানো বইগুলি দিয়ে আসা।

মাইকেলের কাছে ফ্যারাডে পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কথা জর্জ রিবাউ ক্রমে জানতে পারলেন। জেনে দয়াপরবশ হ'য়ে মাইকেলকে তিনি নিজের বই বাঁধাইয়ের কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে নিয়োগ করলেন।

তখনকার দিনে কোন বৃত্তি শিখতে হলে শিক্ষানবীশকে তার জন্যে বেতন দিতে হতো। কিন্তু দয়ালু জর্জ রিবাউ শিক্ষানবীশ মাইকেল ফ্যারাডের কাছ থেকে বেতন গ্রহণ করলেন না। নিজেই হাতে-কলমে তাঁকে কাজ শেখাতে লাগলেন।

১৮১০ সালে মাইকেলের বাবা মারা গেলেন। ভাই রবার্ট কামারের কাজ ক'রে যা পায় তাতেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলে। মাইকেল তখনও শিক্ষানবীশ। রোজগার করেন না। বই বাঁধাই-এর কাজ শেখেন।

বেশ চালাক চতুর ছেলে ছিলেন মাইকেল। অল্পকালের মধ্যেই খুব ভাল ভাবে রপ্ত করে ফেলেছিলেন বই বাঁধানোর আর্ট। আজও তাঁর নিজের হাতে বাঁধানো কিছু বই লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিট্যুশনে সযত্নে রাখা আছে। যে কোনও লোক সেখানে গিয়ে সেগুলি দেখতে পারেন।

জর্জ রিবাউ-এর কারখানায় বাঁধাই-এর জন্যে যে সব বই আসতো তার অধিকাংশই যত্ন সহকারে পড়ে ফেলতে লাগলেন মাইকেল। তড়িৎ আর রসায়ন বিজ্ঞানের বই পড়তে তাঁর খুব ভাল লাগতো। আর ভাল লাগতো বিশ্বকোষ-এর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলো পড়তে। শুধু পড়াই নয়—ভাল লাগার মতো কোন বিষয়বস্তু নজরে পড়লে তিনি সযত্নে তা একটা খাতায় লিখে রাখতেন।

মাইকেল ফ্যারাডে এই বয়েসেই নিজের কাজ ও লেখাপড়া নিয়ে এতই মগ্ন থাকতেন যে, বাইরের জগতের কোন খবরাখবরই রাখতেন না বললে চলে। একদিনের একটি ঘটনা উল্লেখ করলে ব্যাপারটা বোঝা আরও সহজ হবে।

একদিন মাইকেল কাজের অবসরে কারখানায় তাঁর নিজের টেবিলে বসে কি একটা বই খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন। এমন সময় তাঁর সহকর্মী আর এক শিক্ষানবীশ সেখানে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে

বলতে লাগলো : খবর—জোর খবর ! রাশিয়ায় নেপোলিয়ান খুব জোর মার খেয়েছেন। তাঁর সেনাদল সেখানে সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'য়ে গেছে।

কানের কাছে অত জোর চেঁচানিতেও মাইকেল অন্যমনস্ক হলেন না। একটিবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, 'কার সেনাদল ?'—ব্যস ঐটুকু বলেই তিনি আবার বই পড়ায় মন দিলেন।

মাইকেল ফ্যারাডে বই বাঁধাই ক'রে আর বই পড়েই ক্ষান্ত হলেন না। কারখানায় বসে কয়েকটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বানিয়ে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি ক'রে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাতে লাগলেন। প্রায়ই তাঁকে দেখা যেতো ফুৎনল আর কাচনল নিয়ে রসায়নের নানারকম পরীক্ষা করতে।

জর্জ রিবাউ বলেছিলেন : আমার কারখানায় অনেক শিক্ষা-নবীশ রেখেছি। দেখেছি তাদের কাজকর্ম ও চালচলন, কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডের মতো এমন বিচিত্র স্বভাবের শিক্ষানবীশ আমি কখনও দেখি নি। এই বয়েসের যুবকেরা খেলা করতে ভালবাসে। ভালবাসে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা মারতে। কিন্তু মাইকেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছেলে। কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই সে বই পড়ে ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়ে মত্ত থাকে। এ ছেলে জীবনে উন্নতি করবেই।

—হ্যাঁ, পুস্তক বিক্রেতা জর্জ রিবাউ-এর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। সত্যিই পরবর্তী জীবনে মাইকেল ফ্যারাডে বিজ্ঞানী হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

লণ্ডনের পথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক দোকানের জানালায় ফ্যারাডে একটি অভিনব বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করলেন। সেই বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে মিষ্টার জে. টটাম নামে এক ভদ্রলোক ডোরসেট স্ট্রীটে নিজের বাড়িতে তড়িৎ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ের

উপর বক্তৃতা দেবেন। টিকিটের হার বক্তৃতা পিছু এক শিলিং।

বিজ্ঞাপনটি পড়ে ফ্যারাডের ঐ বক্তৃতা শোনার খুব ইচ্ছা হলো। কিন্তু টিকিটের দাম জোগাড় করবেন কোথা থেকে! অত পয়সা তো তাঁর নেই। যা আছে, তা দিয়ে মাত্র হু'টি কি তিনটি বক্তৃতা শোনা যাবে মাত্র। তারপর ?—

বড় ভাই 'রবার্ট' একথা জানতে পেরে মাইকেলকে অবশিষ্ট বক্তৃতাগুলি শোনার জন্যে কিছু টাকা দিলেন।—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো মাইকেলের।

মাইকেল টটাম সাহেবের বক্তৃতাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন। শুধু শোনাই নয়। সেগুলি মনে রাখার জন্যে খাতায় সাধ্যমতো লিখে রাখতে লাগলেন। যে সব যন্ত্রপাতি পরীক্ষা দেখানোর সময় টটাম সাহেব ব্যবহার করেছিলেন, তার ছবিও মাইকেল তাঁর খাতায় এঁকে রাখলেন।—এমন ক'রে বক্তৃতা শুনি আমরা ক'জনে ?

দেখতে দেখতে ফ্যারাডের শিক্ষানবীশ জীবনের সাতটি বছর পূর্ণ হলো। তার পরের একটি ঘটনায় তাঁর জীবনের মোড় গেল ঘুরে।

মিষ্টার ডান্স নামে এক ভদ্রলোক লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের সভ্য ছিলেন। বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। জর্জ রিবাউ-এর কারখানায় তিনি বই বাঁধাতে এলেন একদিন। এসে দেখলেন যে দোকানের এক কারিগর এক মনে বিদ্যুৎ সম্পর্কে লেখা একখানি দুরূহ বই খুব মন দিয়ে পড়ছে। তাই দেখে খুব খুশী হলেন মিষ্টার ডান্স। নামধাম জিজ্ঞাসা করার পর তিনি সেই কারিগর ফ্যারাডেকে উপহার দিলেন চারখানি টিকিট।—সিনেমা বা থিয়েটারের টিকিট নয়, বক্তৃতা শোনার টিকিট।

কার বক্তৃতা ?

কি বিষয়ের বক্তৃতা ?

হ্যাঁ, সেই কথাই বলব এখন।

তখনকার দিনে ইংলণ্ডে 'স্যার হামফ্রি ডেভি' নামে একজন নাম-করা বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ভাল বক্তৃতাও দিতে পারতেন। বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলিকে বেশ সহজ ক'রে গুছিয়ে বলতে পারতেন তিনি। বক্তা সেই ভদ্রলোকই। লণ্ডন শহরে চারদিন বক্তৃতা দেবেন ডেভি। তাঁর বক্তৃতা শুনতে হ'লে টিকিট কাটতে হবে। মিষ্টার ডান্স ডেভির বক্তৃতা শুনবার চারখানি টিকিট কেটে উপহার দিলেন মাইকেল ফ্যারাডেকে।

ফ্যারাডের বয়স তখন একুশ বছর। তিনি তখন আর জর্জ রিবাউ-এর বই বাঁধাই-এর কারখানায় শিক্ষানবীশ নন্—পুরোদস্তুর কারিগর। মাইনে পান সপ্তাহে দেড় গিনি করে। মাইনে নেহাৎ মন্দ নয়।

যাই হোক ফ্যারাডে স্যার হামফ্রি ডেভির বক্তৃতাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলেন। অভ্যাসমতো বক্তৃতার বিশদ বিবরণ খাতায় টুকে রাখলেন।

বক্তৃতা দেবার সময় ডেভি কিছু কিছু পরীক্ষাও দেখিয়েছিলেন। ফ্যারাডে সেই সব পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ছবিও খাতায় এঁকে ফেললেন। তারপর বাড়িতে বসে সুন্দর হস্তাক্ষরে সেগুলি আবার লিখে এবং যন্ত্রপাতির ছবিগুলি নতুন ক'রে সুন্দরভাবে এঁকে ছবি সমেত সেই 'নোট-খাতাটি' নিজেই বাঁধিয়ে ফেললেন। তারপর একদিন সেই বাঁধানো নোট খাতাটি এবং তার সঙ্গে একখানি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী ডেভির কাছে।

দুই

১৮১২ সালের ডিসেম্বর মাস।

বড়দিন আসছে। লণ্ডন শহরে তখন বড়দিনের জোর প্রস্তুতি চলছে। শুরু হ'য়ে গেছে হৈ-হুল্লোড়, ঘরদোর, রাস্তাঘাট ও পার্কগুলি সাজানো-গোছানোর পালা। বড়দিন আসছে বলে ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের মনেই স্ফূর্তির আমেজ। ব্যতিক্রম শুধু মাইকেল ফ্যারাডে। তিনি বিমর্ষ। কারণ বই বাঁধানোর কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে মন চায় না তাঁর। তিনি চান হাতে-কলমে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে, বিজ্ঞানী হতে।

যাই হোক, ক্রিস্টমাসের ঠিক আগের দিনে একখানি গাড়ী এসে দাঁড়ালো জর্জ রিবাউ-এর দোকানের সামনে। এক চাপরাশি গাড়ী থেকে নেমে এসে ফ্যারাডের নামে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। তরুণ ফ্যারাডে আগ্রহের সঙ্গে সেই চিঠিখানি খুলে ফেললেন। চিঠিখানি লিখেছেন লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিট্যুশন থেকে স্যার হামফ্রি ডেভি। ডেভি লিখেছেন :

মিস্টার ফ্যারাডে সমীপেষু

মহাশয়,

নোট খাতাখানি পাঠিয়ে আপনার গভীর অনুভূতি, স্মৃতিশক্তি এবং অভিনিবেশের যে প্রমাণ দিয়েছেন তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি লণ্ডন শহরের বাইরে যাচ্ছি। ফিরব জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে। ফিরলে পর আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আপনার কোন উপকারে আসতে পারলে আমি আনন্দিত হব।

ইতি

আপনার বিশ্বস্ত

হামফ্রি ডেভি

—ফ্যারাডে ডেভির চিঠিখানি বারবার পড়লেন। পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সারা মুখে। ক্রিস্টমাসটা তাহলে ভালই কাটবে মনে হচ্ছে—ভাবলেন তিনি।

দু দিন পরে ফ্যারাডেকে বিস্মিত ক'রে ডেভির আর একখানি চিঠি এলো। চিঠিতে ছিল একটি অনুরোধ। রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের ত্রৈমাসিক পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশের জন্যে ডেভির লেখা একটি প্রবন্ধের 'ফেয়াব কপি' ক'রে দেবার অনুরোধ!—নাইট্রোজেন ক্লোরাইড নামক একটি যৌগ নিয়ে পরীক্ষা করার সময় আকস্মিক এক বিস্ফোরণে ডেভির চোখ সামান্য জখম হওয়ার ফলেই এই অনুরোধ।

১৮১১ সালে 'ড্যুলং' নামে এক বিজ্ঞানী নাইট্রোজেন ক্লোরাইড যৌগটি আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ যৌগটির রাসায়নিক ধর্ম অনুসন্ধানের পরীক্ষা চালাবার সময় 'ড্যুলং' তাঁর একটি চোখ এবং হাতের তিনটি আঙুল হারিয়েছিলেন। এ-হেন বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ডেভিও জখম হলেন। তবে সৌভাগ্য এই যে, চোখটি তাঁর হারাতে হয় নি।

যাই হোক, ফ্যারাডে ডেভির অনুরোধ রক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন।

ডেভির হাতের লেখা খুবই অপরিষ্কার ও অস্পষ্ট ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্যারাডে ডেভির ঐ অস্পষ্ট লেখার মর্ম উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। তারপর সেগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দরভাবে খাতায় লিখে ফেললেন। লেখা সম্পূর্ণ করতে সময় লাগলো মাত্র তিনটি দিন। এই তিন দিনের পরিশ্রমের জন্যে ডেভি তাঁকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন ত্রিশ শিলিং। —ত্রিশ শিলিং দক্ষিণা পাওয়াটা বড় কথা নয়। তার চেয়ে বেশী লাভ হলো ডেভির নজরে পড়া, তাঁর প্রতি ডেভির ভাল ধারণার সৃষ্টি হওয়া। আর সেই লাভের ফলেই পরবর্তীকালে ফ্যারাডের জীবনের গতিপ্রকৃতি গেল পাল্‌টে।

যথাসময়ে ডেভি লণ্ডনে ফিরে এলেন। ১৮১৩ সালের গোড়ার দিকে ফ্যারাডেকে তিনি ডেকে পাঠালেন রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনে।

প্রথম সাক্ষাতে ফ্যারাডে তাঁর মনের কথা খুলে বললেন ডেভিকে। জানালেন যে, বই বাঁধাই-এর কাজ ভাল লাগে না তাঁর। কারণ এ-কাজের দ্বারা কোন মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তিনি বিজ্ঞানী হতে চান। আর সেজন্যে চাই স্যার হামফ্রি ডেভির আনুকূল্য। রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনে সামান্যতম কাজ পেলেও তিনি খুশী হবেন—নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

সব শুনে ডেভি বললেন: এদেশে বিজ্ঞানীরা বেশী পয়সা পান না। আমিও পাই না। তবে নানা সূত্রে আমার বাড়তি রোজগার আছে বলেই বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারি। আমার তো মনে হয়, বই বাঁধানোর পেশাটা মন্দ নয়। এমন একটা পেশা ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞানী হবার আকাঙ্ক্ষায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ানো উচিত হবে না।

ডেভির এই কথাগুলি তরুণ ফ্যারাডের কাছে মোটেই উৎসাহ-ব্যঞ্জক বলে মনে হলো না তবুও নিরাশ না হ'য়ে ফ্যারাডে ডেভিকে তাঁর জীবনের লক্ষ্যের কথা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়ে এলেন।

১৮১৩ সালের একটি ঘটনা।

রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের গবেষণাগারে দু'জন গবেষণা-সহকারীর মধ্যে দারুণ ঝগড়া হলো। প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি। দু'জনের একজন হলেন 'উইলিয়মপেইনী' এবং অপরজন 'নিউম্যান'।

উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কানে গেল কথাটা। তাঁরা অনুসন্ধান ক'রে পেইনীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। ফলে পেইনীর চাকরি গেল। নতুন গবেষণা-সহকারী কে হবেন তাই নিয়ে বেশ কিছুদিন রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের কর্মীদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা চললো।

শেষে স্যার হামফ্রি ডেভির সুপারিশে পেইনীর শূন্য পদ পূরণের জন্যে মনোনীত করা হলো মাইকেল ফ্যারাডেকে। চাকরির সুপারিশ পত্রে ডেভি লিখেছিলেনঃ ফ্যারাডে বয়সে তরুণ, বেশ চট্‌পটে, হাসিখুশি আর বুদ্ধিমান।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরে রয়্যাল ইনস্টিট্যুশন থেকে ফ্যারাডের ডাক এলো। দুরু দুরু বক্ষে ফ্যারাডে সেখানে গিয়ে ডেভির সঙ্গে দেখা করলেন। ডেভি হাসিমুখে ফ্যারাডের হাতে ধরিয়ে দিলেন চাকরির নিয়োগপত্রটি।—স্থির হলো, ফ্যারাডেকে ডেভির গবেষণা-সহকারী হিসাবে কাজ করতে হবে। বেতন সপ্তাহে মাত্র পঁচিশ শিলিং। এ ভিন্ন রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের দোতলার একখানি ঘরে ফ্যারাডে বাস করতে পারবেন।

বই বাঁধাইয়ের দোকানে ফ্যারাডে যে বেতন তখন পেতেন, এ চাকরিতে বেতন তার চেয়েও কম। তা হোক্ গে। ফ্যারাডে মনের মণিকোঠায় যে আশা এতদিন সযত্নে পোষণ ক'রে এসেছিলেন, আজ তা বাস্তবে পরিণত হলো। ১৮১৩ সালের ৬ই মার্চ তারিখে ফ্যারাডে নতুন পদে যোগ দিলেন।

বীক্ষণাগারে ফ্যারাডেকে এমন অনেক কাজ করতে হতো যা মোটেই সুখকর নয়। ঘরদোর ঝাড়-পোঁছ করা, বোতল ধোওয়া,

টুকিটাকি খবর এ ঘর থেকে ও ঘরে পৌঁছান, পরীক্ষার যন্ত্রপাতি সাজানো—সমস্তই করতে হতো তাঁকে। কিন্তু ফ্যারাডে এ সব কাজ করেও আনন্দ পেতেন। এগুলিকে তুচ্ছ বা ছোট কাজ বলে কখনই মনে করতেন না। তাছাড়া এমন একটি জায়গায় কাজ করার ইচ্ছাই তো এতদিন তিনি মনে মনে পোষণ ক'রে এসেছিলেন। বিজ্ঞানকে তিনি দারুণ ভালবাসতেন। তাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পীঠস্থান রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের বীক্ষণাগার তাঁর কাছে স্বর্গতুল্য বলেই মনে হলো।

১৮১৩ সালের শরৎকালে স্যার হামফ্রি ডেভি একটা বৈজ্ঞানিক সফরের পরিকল্পনা নিলেন। ফ্যারাডেকে তিনি সঙ্গী হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বললেনঃ এই সফরে তুমি আমার সহকারী এবং সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করবে।

ফ্যারাডে লণ্ডন শহরের বাইরে জীবনে পা বাড়ান নি। কাজেই বিদেশ সফরে যেতে হবে শুনে ঘাবড়ে গেলেন। আরও ঘাবড়ালেন—যখন শুনলেন যে প্রথম গন্তব্যস্থল ফরাসী দেশের রাজধানী 'প্যারিস'। কারণ সে সময় ইংলণ্ডের সঙ্গে ফরাসী দেশের যুদ্ধ চলছে। ফরাসীরা ইংরাজদের শত্রু।

ফ্যারাডে এই কথাগুলো ডেভিকে স্মরণ করিয়ে দিতে ডেভি বললেনঃ যুদ্ধের প্রভাব আমাদের বৈজ্ঞানিক সফরে আদৌ পড়বে না। এই মুহূর্তে ফরাসীরা আমাদের শত্রু বটে, তবুও তারা তো সভ্য দেশের মানুষ!

সত্যই তাই!

শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে বিজ্ঞানীদের কদর সর্বদেশে—সর্বকালে। স্যার হামফ্রি ডেভির তখন জগৎজোড়া নাম। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নও তাঁকে যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেন নি। নেপোলিয়ন এই বলে আদেশ জারি করেছিলেন যে, স্যার হামফ্রি

ডেভি সদলবলে ফরাসী দেশে এলে তাঁদের যেন যথোপযুক্ত সম্মান জানানো হয়, তাঁদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে যেন যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়।

ডেভির কাছে এ সব কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন ফ্যারাডে। তিনি ডেভির সঙ্গে বিদেশ সফরে যেতে রাজি হলেন।

এখনকার দিনের কোন সম্মানিত ব্যক্তি বিদেশে গেলে অনেক সময় নিজের মোটর গাড়ীটি পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যান। তখনকার দিনেও অমনি প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে হ্যাঁ, তখন তো আর মোটর গাড়ীর চলন ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তাই সঙ্গে নিতেন নিজেদের ঘোড়ার গাড়ী।

বিদেশ সফরে ডেভির সঙ্গে মালপত্র ছিল সামান্যই। একখানি কোচ গাড়ী। গাড়ীখানি টুকরো টুকরো ক'রে খুলে ফেলা যায়। দরকার মতো আবার জোড়া লাগানও যায়। এ ছাড়া ছিল দু'টি বাক্স। একটিতে নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। অপরটি ছিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা।

সে বছর ১৭ই অক্টোবর তারিখে 'প্লাইমাউথ' বন্দর থেকে ডেভি ও ফ্যারাডে তাঁদের যাত্রা শুরু করলেন। সঙ্গে ডেভির স্ত্রী লেডি ডেভিও গেলেন।

'মোর্লে' বন্দরে অবতরণের পর কোচ গাড়ীখানিকে সেখানে জোড়া লাগান হলো। ভাল জাতের ঘোড়া ভাড়া করে এনে সেই গাড়ীতে জুড়ে ওঁরা ফরাসী দেশ সফর শুরু করলেন।

দু'মাস ওঁরা প্যারিসে কাটালেন। ঐ সময় প্যারিসবাসীদের কাছ থেকে পেলেন সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার। প্যারিসবাসীরা আতিথেয়তার ত্রুটি রাখলেন না। যে সব জাদুঘর ও লাইব্রেরী প্যারিসবাসীদের জন্যে সপ্তাহে মাত্র দু'টি দিন খুলে রাখা হতো, সেগুলি ওঁদের ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন খুলে রাখা হলো।

এখানে অ্যাম্পিয়ার, হামবোল্ট, কুভিয়ের, গে-লুসাক প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ডেভি ও ফ্যারাডের পরিচয় হলো। এঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ বিজ্ঞানীদের আপ্যায়িত করলেন। ভাব ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করলেন।

দু' বছর আগে এম. কোর্তয়িস নামে এক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবসায়ী কালো রঙের একটি পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন অথচ তার প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। কোর্তয়িস সেই কালো পদার্থটি দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী অ্যাম্পিয়ারকে। অ্যাম্পিয়ার সেটি সনাক্ত করতে না পেরে দিলেন স্যার হামফ্রি ডেভিকে।

ফ্যারাডে ও ডেভি যুগ্মভাবে পরীক্ষা চালিয়ে বলে দিলেন যে কালো রঙের ঐ পদার্থটি হচ্ছে আয়োডিন—যার উৎস সামুদ্রিক আগাছা।

ফরাসী বিজ্ঞানীরা ইংরেজ বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন। আবার লজ্জিতও হলেন এই ভেবে যে—তাঁরা যা পারেন নি, তা অনায়াসে ইংরেজ বিজ্ঞানীরা পারলেন দেখে।

ফরাসী দেশ ছেড়ে এর পর ডেভি ও ফ্যারাডে গেলেন ইটালী দেশে। তাঁরা সফর করলেন ফ্লোরেন্স, রোম ও নেপল্‌স। বিজ্ঞানী ডি. লা. রাইভের সম্মানিত অতিথিরূপে তাঁরা দু'মাস কাটালেন জেনিভায়। তড়িৎ বিশ্লেষণের উপর গবেষণা ক'রে ডি লা. রাইভের তখন জগৎজোড়া নাম।

ফ্লোরেন্স নগরীতে ওঁরা অল্প কয়েকদিন রইলেন। শহরের দর্শনীয় স্থান ও বস্তুগুলি দেখে ওঁরা কিন্তু সময় নষ্ট করলেন না। টাস্‌কানির ডিউকের কাছে ছিল বিরাট একখানি লেন্স। সেটি চেয়ে নিয়ে ডেভি ও ফ্যারাডে এক অভিনব পরীক্ষা করলেন। ঐ লেন্সের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে সংহত ক'রে একখণ্ড হীরাকে ওঁরা সম্পূর্ণরূপে দহন করতে সক্ষম হলেন। দহনের সেই পরীক্ষা দ্বারা ওঁরা প্রমাণ করলেন যে, হীরক বিশুদ্ধ কার্বন বা অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপর রোমে কিছুদিন কাটিয়ে ওঁরা গেলেন নেপল্‌সে। সেখানে বিখ্যাত 'ভিসুভিয়াস' আগ্নেয়গিরি পরিদর্শন করলেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ আগ্নেয়গিরি চোখে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতো। ওঁরা কিন্তু শুধু চোখের দেখাই দেখতে যান নি। তাই ভিসুভিয়াসের জ্বালামুখে উপস্থিত হ'য়ে গলিত লাভার উত্তাপে ডিম সিদ্ধ ক'রে ওঁরা তা খেলেন। হাতে-কলমে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন—গলিত লাভার উত্তাপ কী দারুণ!

ইটালীর মিলানে 'ভোল্টা' নামে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে ওঁদের পরিচয় হলো। ভোল্টার নাম অনুসারে বৈদ্যুতিক চাপ পরিমাপের এককের নাম রাখা হয়েছে 'ভোল্ট'। শহরের বাড়ী-গুলিতে যে তড়িৎ সরবরাহ করা হয় তা ২২০ ভোল্টের।

ডেভির সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ ফ্যারাডের কাছে খুবই আরাম ও আনন্দদায়ক মনে হয়েছিল, কারণ এই ভ্রমণের ফলে তিনি সমসাময়িক অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদান করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া আঠার মাস ব্যাপী সফরকালে অজস্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগও পেয়েছিলেন। তবুও এ সফর মাঝে মাঝে তাঁর কাছে বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল। তাঁর এই মানসিক বেদনার মূলে ছিলেন লেডি ডেভি।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি।

লেডি ডেভি ছিলেন অহঙ্কারী মহিলা। তাঁর স্বামী স্যার হামফ্রি ডেভি মস্ত বড় বিজ্ঞানী, জগৎজোড়া তাঁর নাম—এ বিষয়ে সদা-সচেতন ছিলেন লেডি ডেভি। বিজ্ঞান জগতে মাইকেল ফ্যারাডের মতো নবাগত এক তরুণ স্যার ডেভির সঙ্গে ওঠাবসা করেন—এটা লেডি ডেভির পছন্দ ছিল না। ফ্যারাডেকে লেডি ডেভি তাঁর স্বামীর বেতনভুক কর্মচারী রূপে দেখতেন। ফ্যারাডের সঙ্গে স্যার হামফ্রি

ডেভির মাখামাখি বিষ নজরে দেখতেন লেডি ডেভি। তাছাড়া জন্ম-সূত্রে ফ্যারাডে তো কামারের ছেলে। পেটে বিদ্যেও কম। এমন লোককে স্যার হামফ্রি ডেভির সহযোগী বিজ্ঞানীরূপে স্বীকৃতি দিতে লেডি ডেভি ছিলেন নারাজ। তাঁর বিরূপ মন্তব্য বা কটাক্ষগুলি ফ্যারাডেকে ব্যথিত করতো। সে সব কটাক্ষ সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝে ফ্যারাডের ইচ্ছে হতো ছুটে পালাতে স্বদেশে।

ডেভির সফরসূচীতে গ্রীস ও তুরস্কের নামও ছিল কিন্তু সম্ভবতঃ যুদ্ধকালীন ইউরোপের অনিশ্চিত অবস্থার কথা বিবেচনা করেই স্যার ডেভি তাঁর সফরসূচী সংক্ষিপ্ত করলেন। ও দু'টি দেশ সফর না করেই তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে। আর লেডি ডেভির সান্নিধ্য এড়াতে পেরে ফ্যারাডেও খুশী হলেন।

॥ তিন ॥

লণ্ডনে ফিরে এসেই ফ্যারাডে রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনে আবার কাজে লেগে গেলেন। তাঁর বেতন বেড়ে দাঁড়াল সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং। বেতন আরও বেড়ে বছরে একশো পাউণ্ড হবে—এস আশ্বাসও পেলেন। তাছাড়া ইনস্টিট্যুশন ভবনে বসবাসের জন্যে একখানির বদলে দু'খানি ঘর পাওয়ার আশ্বাস পেলেন।

লণ্ডন শহরে তখন একটি দার্শনিক সংস্থা ছিল। ফ্যারাডে সেই সংস্থায় যোগ দিলেন। এতে যোগ দিয়ে অনেক পড়াশুনা ক'রে তিনি বক্তৃতা দেবার আর্ট বা কলাকৌশল রপ্ত করলেন। তারপর ১৮১৬ সালের জানুয়ারী মাসে রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনে ফ্যারাডে বক্তৃতা দিলেন। জীবনে সেই তাঁর প্রথম বক্তৃতা।

প্রায় একই সময়ে বিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নাম 'টাসকানি থেকে পাওয়া চুনের বিশ্লেষণ'।

ফ্যারাডে রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনে রুটিন মাফিক কাজ ক'রে যান। ডেভি এবং রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ব্র্যাণ্ডের গবেষণার যন্ত্রপাতি

প্রস্তুত করেন। গবেষণাগারে খনিজ পদার্থগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম অনুসারে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন। আর কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই খনিজ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের বই নিয়ে পড়াশুনা করেন। বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব পত্র-পত্রিকা রয়্যাল ইনষ্টিট্যুশনে আসতো তার সব ক'টিই মন দিয়ে পড়তেন ফ্যারাডে। শুধু তাই নয়। হাতে-কলমে পরীক্ষা ক'রে পত্রিকায় পড়া তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করে নিতেন।

কয়লা খনির ভিতরে এক রকম দাহ্য গ্যাস সৃষ্টি হয়। সেই গ্যাসের নাম 'ফায়ার ড্যাম্প'। আসলে 'ফায়ার ড্যাম্প' হচ্ছে দাহ্য গ্যাস 'মিথেন' ও বায়ুর মিশ্রণ। সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে এলেই ফায়ার ড্যাম্পে আগুন ধরে যায় ও খনির মধ্যে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে।

খনির ভেতরটা অন্ধকার বলে তখনকার দিনে খনি শ্রমিকেরা মোমবাতি বা কেরোসিন তেলের কুপী জ্বেলে খনির মধ্যে কাজ করতো। আর তাদের ব্যবহৃত বাতির শিখা ফায়ার ড্যাম্পের সংস্পর্শে এসে খনির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাতো। সেই বিস্ফোরণের ফলে খনিতে আগুন লেগে যেতো ও বহু শ্রমিক অকালে প্রাণ হারাতো।

এই দুর্ঘটনা এড়াবার উপায় উদ্ভাবনের ভার পড়লো স্যার হামফ্রি ডেভির উপর। ডেভি তখন তাঁর সহকারী মাইকেল ফ্যারাডের সহায়তায় অনেকগুলি পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন ক'রে আবিষ্কার ক'রে ফেললেন 'নিরাপদ বাতি'। সে বাতির নাম রাখা হলো 'ডেভির নিরাপদ বাতি।' সাধারণ একটা তেলের বাতি। তার শিখার চারদিক ঘিরে লোহার তারজালির একটা চিমনী বসানো। —অতি সামান্য ব্যবস্থা, অথচ এই ব্যবস্থাই ফায়ার ড্যাম্প হ'তে বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা নিবারণে সক্ষম হলো। হাজার হাজার খনি

শ্রমিকের অমূল্য জীবন রক্ষা পেলো।

নিরাপদ বাতির শিখা একটা লোহার তারজালির ভেতরে জ্বলে। দাহ্য গ্যাস বাতির চিমনীর ভেতরে অগ্নিশিখার সংস্পর্শে এলে নীলাভ শিখায় জ্বলে ওঠে বটে, তবে তা লোহার তারজালির চিমনীর বাইরে ছড়াতে পারে না। লোহার তারজালি উত্তাপ টেনে নেয় বলে বাইরের দাহ্য গ্যাস সহসা জ্বলে ওঠার মতো উত্তপ্ত হতে পারে না। খনি শ্রমিকেরা নিরাপদ বাতির ঐ রকম নীলাভ শিখা দেখলেই সাবধান হ'য়ে যায় ও দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়।

সেকালে ডেভির নিরাপদ বাতি উদ্ভাবন মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের একটা অতুলনীয় অবদান বলে গণ্য হয়েছিল। আর এ বাতির সঙ্গে ডেভির নাম জড়িত থাকলেও এর উদ্ভাবনে ফ্যারাডের যে অসামান্য অবদান ছিল তা ডেভি নিজেই স্বীকার ক'রে গেছেন।

স্যার হামফ্রি ডেভির গবেষণায় সহায়তা করা ভিন্নও ফ্যারাডে এই সময় স্বাধীনভাবে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শুরু করেন।

আজকাল মরিচাবিহীন ইস্পাত আমাদের অতি পরিচিত জিনিস। অনেকেরই ধারণা যে ১৯১৬ সালে শেফিল্ডে মরিচাবিহীন ইস্পাত আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ফ্যারাডে যে এর একশো বছর আগেই রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের বীক্ষণাগারে মরিচাবিহীন ইস্পাত প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা অনেকেরই জানা নেই।

মরিচাবিহীন ইস্পাত আবিষ্কার ছাড়াও ইস্পাতের ধর্ম নিয়ে বেশ কয়েক বছর ফ্যারাডে গবেষণা করলেন। কয়েক রকম সংকর ইস্পাতও তৈরি করলেন। সে সময় এখনকার মতো উন্নত ধরণের চুল্লী আবিষ্কৃত হয় নি। বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলও আজকের মতো এত উন্নত ছিল না। তবুও কি ক'রে ফ্যারাডে এত সুন্দর সুন্দর সংকর ইস্পাত তৈরি করতে পেরেছিলেন নিজের বীক্ষণাগারে বসে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

এই সময় ক্লোরিন ও তার যৌগগুলি নিয়েও গবেষণা চালালেন ফ্যারাডে। সেই গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হলো 'ক্লোরিন হাইড্রেট' নামক একটি যৌগ। ক্লোরিনের জলীয় দ্রবণকে শীতল ক'রে ক্লোরিন হাইড্রেটের সাদা স্ফটিক পাওয়া গেল। এ ভিন্ন ফ্যারাডে আপন প্রচেষ্টায় সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাসকে তরল করতে সক্ষম হন।

১৮২১ সালে ফ্যারাডে তিরিশ বছরে পা দিলেন। ফ্যারাডের জীবনের স্মরণীয় বছর সেটি। সে বছর তিনি বিয়ে করলেন 'সারা বার্নার্ড'কে। তাছাড়া জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটিও ঘটলো সেই বছরেই। আবিষ্কারটি ছিল তড়িৎ-চুম্বক সম্পর্কিত। আর এই তড়িৎ-চুম্বক সম্পর্কিত গবেষণাই ফ্যারাডেকে বিজ্ঞানী হিসাবে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

বিয়ের দু' বছর বাদে ১৮২৩ সালের শেষের দিকে ফ্যারাডে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন। এই সময় বিজ্ঞানী ডেভির স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে শুরু করে এবং তিনি রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের কাজকর্ম থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেন। ১৮২৫ সালে তাঁরই সুপারিশে ফ্যারাডেকে রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের বীক্ষণাগারের অধিকর্তা (ডিরেক্টর) নিযুক্ত করা হয়। স্থির হয়—তিনি অর্থাৎ ফ্যারাডে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ব্র্যাণ্ডের তত্ত্বাবধানে কাজকর্ম চালাবেন।

পদোন্নতি হ'লেও ফ্যারাডের বেতন কিন্তু তখন বাড়লো না। আগের মতই বছরে তিনি একশো পাউণ্ড ক'রে বেতন পেতে লাগলেন।

এই সময় অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে ফ্যারাডের ডাক আসতো। বিজ্ঞানের, বিশেষ ক'রে রাসায়নিক বিশ্লেষণের নানা সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনি প্রচুর অর্থও পেতেন। কাজেই এ সময় তাঁর জীবনে আসে আর্থিক স্বাচ্ছল্য।

অধিকর্তার দায়িত্বভার পেয়ে ফ্যারাডে রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনে নবজীবন সঞ্চার করেন। তাঁরই নির্দেশে ও প্রচেষ্টায় ইনস্টিট্যুশনের বক্তৃতা কক্ষে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞান আলোচনাচক্র এবং পরীক্ষা প্রদর্শন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। সে প্রথা আজও প্রচলিত আছে।

বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলি খুব সহজ ও সুন্দরভাবে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বলতে পারতেন ফ্যারাডে। তাই রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে প্রচুর জনসমাগম হতো। প্রতি বছর ক্রিস্টমাসের দিনে তিনি ছোটদের জন্যে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিতেন। বিষয়ঃ 'মোমবাতির রাসায়নিক ইতিহাস'। নানান্ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মোমবাতির রাসায়নিক ইতিহাস তিনি ছোটদের বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর সেই বক্তৃতা শুনবার জন্যে শুধু ছোটরাই নয়, বড়রাও ভিড় করতেন।

১৮২৭ সালে লণ্ডনের এক বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যারাডেকে রসায়নশাস্ত্র অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানান্। কিন্তু ফ্যারাডে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে বলেন: রয়্যাল ইনস্টিট্যুশন ছাড়া আর কোথাও কাজ করার ইচ্ছা নেই তাঁর। অবশ্য কিছুকাল বাদে রাজকীয় সামরিক বাহিনীর কলেজে তিনি পার্ট-টাইম অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দিতে সম্মত হন। বছরে সেখানে তাঁকে কুড়িটি করে বক্তৃতা দিতে হতো।

ফ্যারাডে বলতেন: মানুষের জীবনটাই হচ্ছে সমস্যার মোকাবিলা করার জন্যে। নিত্য নতুন সমস্যা আসবে। সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে। তবেই তো জীবন হবে গতিশীল। প্রকৃতিই অহরহ আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে অগণিত সমস্যা। আমার বিশ্বাস—ঠিক পথে যত্ন সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে সে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সেকালে লণ্ডন শহরের ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিদের বাসগৃহ

আলোকিত করবার জন্যে এক রকম গ্যাস ব্যবহার করা হতো। তিমি মাছের তেল গরম ক'রে সে গ্যাস উৎপন্ন করা হতো। তার পর ত্রিশ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সেই গ্যাসকে লোহার সিলিণ্ডারে পুরে ঘরে ঘরে বিক্রি করা হতো।

এই গ্যাস ব্যবহার করার পর সিলিণ্ডারের তলায় এক রকম তরল পদার্থ পড়ে থাকতে দেখা যেত। সেই তরল পদার্থটি যে কি—তা আবিষ্কার করার জন্যে ফ্যারাডে অনুসন্ধান চালান। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি বুঝতে পারেন যে ঐ তরল পদার্থটি একাধিক পদার্থের মিশ্রণ। ফ্যারাডের গবেষণার ফলে জানা যায় যে ঐ তরলের অন্তর্গত একটি পদার্থ হলো 'বাই কার্বুরেট অফ হাইড্রোজেন', যার বর্তমান পরিচয় 'বেনজিন' নামে। আলকাতরা থেকে পাওয়া যায় 'বেনজিন' এবং এ যুগে রঞ্জন শিল্পে বেনজিন একটি অতি প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল।

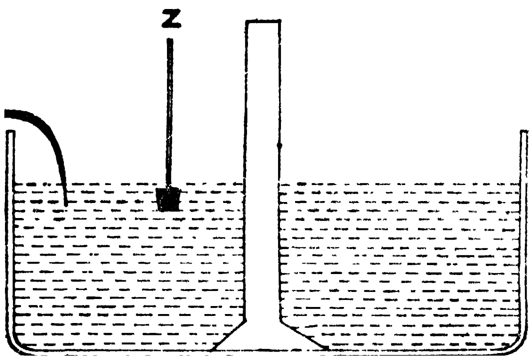
রয়্যাল সোসাইটির আর্থিক সহায়তায় এরপর ফ্যারাডে কিছুকাল উন্নত মানের চশমার কাচ তৈরি করার উদ্দেশ্যে গবেষণা চালান। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি চুম্বকত্ব ও আলোক শক্তির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পান।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করলেও চুম্বক ও তড়িৎ বিজ্ঞান নিয়েই ফ্যারাডে বেশী চিন্তাভাবনা করতেন। এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করতেই তাঁর গবেষক জীবনের অধিকাংশ সময় কেটে যায়।

১৮২০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়েরষ্টেড আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎবাহী কোন তারকে যদি একটি চুম্বক শলাকার উপরে সমান্তরালভাবে ধরে রাখা যায়, তাহলে চুম্বক শলাকাটি তার মূল অবস্থান থেকে বিক্ষিপ্ত হবে— উত্তর-দক্ষিণ মুখী হ'য়ে আর থাকবে না।

এরপর চুম্বকের উপর তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়ায় চুম্বক শলাকার বিক্ষেপের অভিমুখ সংক্রান্ত নিয়মটি আবিষ্কার করেন ফরাসী বিজ্ঞানী আঁদ্রে মেরী অ্যাম্পিয়ার।

ওয়েরষ্টেড ও অ্যাম্পিয়ারের গবেষণায় আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ বিজ্ঞানী 'ওলাস্টোন' এরপর তড়িৎপ্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয় যে, চুম্বকের প্রভাবে তড়িৎবাহী তারের বিক্ষেপ বা ঘূর্ণনও সম্ভব। এ নিয়ে তিনি স্যার হামফ্রি ডেভির সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করেন কিন্তু ডেভি ওলাস্টোনের ধারণা ভ্রান্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ওলাস্টোন অনেক চেষ্টা করেও এমন কোন পরীক্ষা উদ্ভাবন করতে পারেন না, যার দ্বারা তড়িৎপ্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়ার ফল প্রত্যক্ষ করা যায়।—সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করলেন মাইকেল ফ্যারাডে।



ইলেকট্রিক মোটরের নীতি সংক্রান্ত পরীক্ষার স্কেচ।

ফ্যারাডে একটা ছোট কাপ নিলেন। কাপটি কানায় কানায় পারদ দিয়ে ভরলেন। একটি চুম্বক দণ্ডকে পারদপূর্ণ কাপের মাঝখানে খাড়া ভাবে দাঁড় করালেন। চুম্বক দণ্ডের এক প্রান্ত কাপের পারদের মধ্যে ডুবে রইলো। অপর প্রান্ত রইলো পারদের উপরে মাথা তুলে।

একটি তামার তারের একপ্রান্তে এক টুকরো কর্ক গিঁথে সেটিকে খাড়া অবস্থায় ফ্যারাডে এমন ভাবে ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে ক'রে তারের কর্ক গেঁথা প্রান্তটির কিছুটা কাপের পারদের মধ্যে ডুবে থাকে ও সেই প্রান্তটি থাকে চুম্বক দণ্ডের একপাশে। ফ্যারাডে এই ঝুলন্ত তামার তারের অপর প্রান্তের নাম দিলেন Z.

এরপর ফ্যারাডে আর একটি তামার তার বঁড়শির আকারে বেঁকিয়ে তার এক প্রান্ত ডোবালেন কাপের পারদে এবং অপর প্রান্ত (C) কাপের কিনারার উপর রেখে বাইরে ঝুলিয়ে দিলেন। ফ্যারাডে এরপর তামার তার দু'টির Z এবং C প্রান্ত যেই না একটি ব্যাটারির দুই মেরুর সঙ্গে যুক্ত করলেন, অমনি ঝুলন্ত তামার তারটি চুম্বক দণ্ডের চারপাশে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

তড়িৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের বিস্ময়কর প্রভাব প্রত্যক্ষ ক'রে অবাক হলেন ফ্যারাডে। আনন্দে দিশাহারা হ'য়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনলেন এই পরীক্ষাটি দেখাতে।

স্ত্রী সারা ছুটে এসে পরীক্ষাটি দেখলেন কিন্তু তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পেরে স্বামীর উপর বিরক্ত হলেন। বিরক্ত হবারই কথা।— কারণ সেটা ছিল ক্রিস্টমাসের দিন এবং ঐ সময় 'সারা' রান্নাঘরে ভাল ভাল খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলেন। সেই কাজ ছেড়ে খেয়ালী স্বামীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল দেখতে আসা তাঁর কাছে সময়ের অপচয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু সারা সেদিন বুঝলেন না যে তাঁর স্বামীর ঐ পরীক্ষার সাফল্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও নবযুগের সূচনা করবে।

সত্যিই তাই।

ঐ পরীক্ষাটিই বৈদ্যুতিক মোটর যন্ত্রের মূলনীতি ব্যাখ্যা করলো।

ফ্যারাডে তাঁর এই পরীক্ষাটির বিবরণ রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। বিজ্ঞানী ওলাস্টোন

ও ডেভির কাছ থেকে এই পরীক্ষাটির ধারণা পেয়েছিলেন ফ্যারাডে, কিন্তু ওঁদের ঋণ স্বীকার না ক'রে পরীক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করায় বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হলেন ফ্যারাডে। পরে অবশ্য তিনি ওলাস্টোন ও ডেভির কাছে নিজের ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেন।

ফ্যারাডের এই পরীক্ষার সাফল্য সূচনা করলো বৈদ্যুতিক মোটরের জন্ম। বৈদ্যুতিক মোটরের শক্তিতে আজ চলছে বৈদ্যুতিক পাখা, ট্রামগাড়ি, গম পেষাই কল ও বৈদ্যুতিক পাম্প। বৈদ্যুতিক মোটরের ব্যবহারিক প্রয়োগ আজ মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। এর জন্যে আমরা মাইকেল ফ্যারাডের কাছে ঋণী।

॥ চার ॥

স্যার হামফ্রি ডেভিকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল: "আপনার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটি কি?"

উত্তরে ডেভি বলেছিলেন: 'মাইকেল ফ্যারাডে'। সত্যিই, মাইকেল ফ্যারাডেই ডেভির জীবনের সেরা আবিষ্কার। বই বাঁধাই-কারী যুবক ফ্যারাডেকে বিজ্ঞানী ফ্যারাডেতে পরিণত করার পথ তিনিই প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। ফ্যারাডেকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে পরম বন্ধু ও সহকর্মীর মত ব্যবহার করতেন।

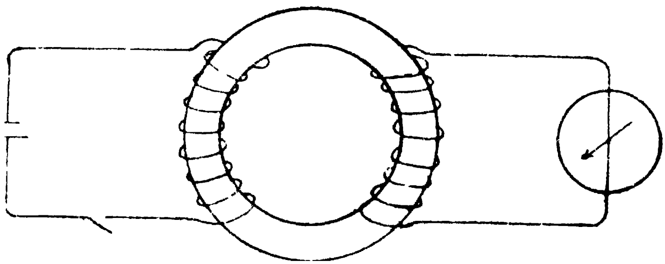
১৮২৯ সালে ডেভি ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুতে ফ্যারাডে একজন পরম হিতৈষী বন্ধু ও পথ প্রদর্শককে হারালেন কিন্তু ডেভির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলেন না। ডেভির আদর্শ অনুসরণ করেই ফ্যারাডে তাঁর বিজ্ঞান সাধনা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অনেকদিন ধরেই একটা পরিকল্পনা ফ্যারাডের মাথায় ঘুরছিল। সেটা হলো—বিদ্যুৎ যদি চুম্বক সৃষ্টি করতে পারে, তবে চুম্বকও অবশ্যই বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারবে! আর তা পারলে এই নতুন সূত্র ধরেই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হবে।—এই

ধারণার বশবর্তী হয়েই ফ্যারাডে দশ বছরেরও বেশি সময় গবেষণা চালালেন। উদ্দেশ্য—চুম্বকের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা।

এই ভাবনা যখন ফ্যারাডের মাথায় ঢোকে তখন তিনি সব সময় তাঁর কোটের পকেটে একটি চুম্বক দণ্ড ও কিছু পেঁচানো তামার তার রাখতেন। অবসর সময়ে পকেট থেকে ঐ দুটি জিনিস বের ক'রে ভাবতেন—কি ভাবে এদের সাজালে চুম্বক দণ্ডটি তামার তারে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করতে পারবে।

১৮৩১ সালে ফ্যারাডের মনস্কামনা পূর্ণ হলো। সে বছর পরীক্ষায় তিনি সফলকাম হলেন। আবিষ্কার করলেন এক নতুন তত্ত্ব—চুম্বকের প্রভাবে তড়িৎ উৎপাদনের তত্ত্ব। এ তত্ত্ব বর্তমানে 'তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ' নামে পরিচিত। নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান জগতে এ এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং এর ফল হলো সুদূরপ্রসারী।



ফ্যারাডের আয়রন রিং এক্সপেরিমেণ্ট।

ফ্যারাডে একটি লোহার রিং-এর উপর দু'টি পৃথক তামার তারকে (তার দু'টি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়) বিপরীতমুখী ক'রে জড়িয়ে নিলেন। তার দু'টির একটিকে তিনি ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। অপর তারটির প্রান্তদ্বয় সংযুক্ত করলেন 'গ্যালভানোমিটার' যন্ত্রের সঙ্গে। গ্যালভানোমিটার হলো তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব নির্দেশক যন্ত্র।

ফ্যারাডে যেই মাত্র প্রথম তারের প্রান্ত দু'টি ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত

করলেন, অমনি গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ দেখা গেল। প্রথম তারটি যখন ফ্যারাডে ব্যাটারি থেকে খুলে ফেললেন, তখনও গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটলো, তবে এবার বিক্ষেপ ঘটলো আগেরবারের বিপরীত দিকে। ফ্যারাডে আরও লক্ষ্য করলেন যে, প্রথম তারের ভেতর দিয়ে যখন তড়িৎপ্রবাহ সম মাত্রায় চলতে থাকে, অথবা তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ থাকে, তখন গ্যালভানোমিটারের কাঁটার কোন বিক্ষেপ ঘটে না।

খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার এটা! প্রথম ও দ্বিতীয় তারের মধ্যে কোন সংযোগ নেই অথচ প্রথম তারটিকে ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত করবার সময় বা ব্যাটারি থেকে খুলে নেবার সময় দ্বিতীয় তারের সঙ্গে যুক্ত গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, প্রথম তারে তড়িতের আবির্ভাবের প্রভাব পড়ে দ্বিতীয় তারে। ফ্যারাডের এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, প্রথম তারের মধ্যেকার তড়িৎ চুম্বক দ্বিতীয় তারের মধ্যে তড়িৎ আবেশ সৃষ্টি করে।

ফ্যারাডে এই পরীক্ষাটির নাম দিয়েছিলেন 'আয়রন রিং এক্সপেরিমেন্ট'। এই পরীক্ষাটিকে আমরা বলতে পারি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের প্রথম ব্যবহার।

প্রশ্ন উঠতে পারে—'ট্রান্সফরমার' জিনিসটা কি?—এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, যে যন্ত্রের সাহায্যে পরিবর্তিত তড়িৎপ্রবাহের (এ. সি.) তড়িৎ চাপ বা ভোল্টেজ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, তারই নাম 'ট্রান্সফরমার'।

ট্রান্সফরমার যন্ত্রের সাহায্যে ভোল্টেজ কমানো যায়, আবার বাড়ানোও যায়। উৎপাদন কেন্দ্রে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তার ভোল্টেজ বেশী থাকে। সেই বেশী ভোল্টেজের তড়িৎ বাড়ীতে এনে এবং তা দিয়ে পাখা, রেডিও, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি চালালে

ঐ বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলি নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই 'স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফরমারের' সাহায্যে ভোল্টেজ কমিয়ে নেওয়া দরকার।

আবার কোন উৎপাদন কেন্দ্রে যদি ২০০০ ভোল্টের তড়িৎ উৎপন্ন হয় এবং তা বহুদূরে পরিবাহী তার মারফৎ পাঠানো হয় তাহলে ভোল্টেজ ক্রমশ কমতে থাকে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানরপর ভোল্টেজ অনেক সময় এতো ক'মে যায় যে তা দিয়ে রেডিও, পাখা ইত্যাদি যন্ত্র চালানো যায় না। সেক্ষেত্রে 'স্টেপ-আপ ট্রান্সফরমার'-এর সাহায্যে ভোল্টেজ বাড়িয়ে নিতে হয়।

ফ্যারাডে এরপর আর একটি পরীক্ষা করলেন। সেই পরীক্ষার জন্যে তিনি নিলেন একটি দণ্ড চুম্বক ও চোঙাকৃতি তারকুণ্ডলী। তারকুণ্ডলীর খোলা প্রান্ত দু'টি ফ্যারাডে যুক্ত করলেন গ্যালভানোমিটার যন্ত্রের সঙ্গে। তারপর দণ্ড চুম্বকটিকে ঐ তারকুণ্ডলীর ভেতরে প্রবেশ করালেন।—সঙ্গে সঙ্গে গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটলো। তারকুণ্ডলী থেকে দণ্ড চুম্বককে বের ক'রে নেবার সময়ও গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটলো। কিন্তু চুম্বক স্থিরভাবে কুণ্ডলীর ভেতরে রাখার সময় গ্যালভানোমিটারের কাঁটার কোন বিক্ষেপ ঘটলো না। তার মানে, তখন তারকুণ্ডলীতে তড়িৎ সৃষ্টি হলো না।

ওয়েরষ্টেডের পরীক্ষার কথা তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছি। তাঁর পরীক্ষাতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে তড়িৎবাহী তারটি ছিল স্থির কিন্তু তারের ভেতরে তড়িৎ ছিল গতিশীল। সেই গতিশীল তড়িৎ-এর প্রভাবে চুম্বক শলাকাব বিক্ষেপ ঘটেছিল। এখন উপরের পরীক্ষাটি হতে ফ্যারাডে বুঝলেন যে তারকুণ্ডলীতে তড়িৎ সৃষ্টির জন্যে চুম্বক দণ্ডকেও গতিশীল করা দরকার।—ফ্যারাডের আগে এ ঘটনা কেউ প্রত্যক্ষ করেন নি।

এইভাবে চুম্বকের সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদনের মূল নীতি

মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করে ফেললেন। তবে তাঁর পরীক্ষায় যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হলো তা দুর্বল। সে তড়িৎপ্রবাহ কেবল মুহূর্তের জন্যে গ্যালভানোমিটারের কাঁটাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে। তাই ফ্যারাডে এতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি চান অবিরাম তড়িৎপ্রবাহ। সেই উদ্দেশ্যে তিনি আবার পরীক্ষা চালাতে লাগলেন।

ফ্যারাডে তখন পার্ট-টাইম অধ্যাপকের কাজ করছেন উলউইচের রাজকীয় অ্যাকাডেমিতে। সেখানকার বীক্ষণাগারে তিনি অশ্বখুরাকৃতি একটি শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক নিলেন। আর নিলেন একটি তামার চাকতি। চাকতিটির ব্যাস প্রায় এক ফুট এবং সেটি এক ইঞ্চি পুরু।

ফ্যারাডে তামার চাকতিটিকে চুম্বকের দু'টি মেরুর মাঝে রাখলেন। এমনভাবে ধুরার উপর রাখলেন যাতে সেটাকে হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে ঘোরানো যায়। হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই চাকতিটি চুম্বকের দুই মেরুপ্রান্তের মধ্যে দিয়ে ঘুরপাক খায়।

এরপর ফ্যারাডে দুটি তামার দণ্ড নিলেন। ঐ দণ্ড দুটির নাম দিলেন 'ব্রাশ' বা 'ঘর্ষণ সংস্পর্শ'। একটি ব্রাশ যুক্ত করলেন ঘূর্ণনক্ষম তামার চাকতির কিনারার সঙ্গে। অপর ব্রাশটি যুক্ত করলেন তামার চাকতির ধুরার সঙ্গে। তারপর এই ব্রাশ দু'টিকে যুক্ত করলেন একটি গ্যালভানোমিটার যন্ত্রের সঙ্গে।

হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে তামার চাকতিটি ঘোরাতেই ফ্যারাডে দেখলেন যে গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটছে। তিনি আরও দেখলেন যে, চাকতিটি যত বেশী জোরে ঘোরে, কাঁটার বিক্ষেপও তত বেশী হয়। তার মানে সেক্ষেত্রে বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আবার চাকতিটি ঘোরানো বন্ধ করলেই গ্যালভানোমিটারের কাঁটা ফিরে আসে শূন্যের ঘরে, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না। —এ ভিন্ন চাকতিটিকে উল্টো দিকে ঘোরালে কাঁটার বিক্ষেপ হয় বিপরীত দিকে, অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ হয় বিপরীতমুখী।

এতদিনে ফ্যারাডের মনস্কামনা পূর্ণ হলো। তিনি অবিরাম তড়িৎপ্রবাহ উৎপাদনের যন্ত্র আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। তৈরি করেছেন বিশ্বের সর্বপ্রথম 'ডায়নামো'।

ডায়নামো থেকে পাওয়া যায় জোরালো তড়িৎপ্রবাহ। এই তড়িতের সাহায্যেই পাখা ঘোরে, রেলগাড়ী ও ট্রামগাড়ী চলে, আলো জ্বলে ঘরে ঘরে, রাস্তাঘাটে ও কলকারখানায়।

বৃটিশ পার্লামেন্টে মাইকেল ফ্যারাডে যখন তাঁর নব আবিষ্কৃত ডায়নামো যন্ত্রের কথা প্রকাশ করলেন তখন গ্লাডস্টোন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। মিষ্টার গ্লাডস্টোন সেদিন ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আপনার এই যন্ত্র থেকে আমাদের কি উপকার হবে বলুন তো?

—বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ফ্যারাডে সেদিন জবাব দিয়েছিলেন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এমন একদিন আসবে, যেদিন আমার এই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ আপনি দেশবাসীর কাছ থেকে প্রচুর ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন।

ফ্যারাডের এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে কিন্তু বেশী দেরি হয় নি। বিদ্যুতের উপর শীঘ্রই কর বসিয়েছিলেন বৃটিশ সরকার।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে ডায়নামো আবিষ্কারের পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ সফল করতে ফ্যারাডের সময় লেগেছিল মাত্র দু'মাস। আর এই পরীক্ষার শেষে পরিশ্রান্ত ফ্যারাডে স্ত্রী সারাকে সঙ্গে নিয়ে এক হপ্তার জন্যে শহরতলী 'ব্রাইটন'-এ গিয়েছিলেন বিশ্রাম নিতে।

পাঁচ

তড়িৎপ্রবাহের ফলে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে।- এই সত্য উদ্ঘাটনের জন্যে ফ্যারাডে কাজ আরম্ভ করেন ১৮৩১ সালে। নানান পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে, তড়িৎ—তা সে স্থির তড়িতই হোক্ বা প্রবাহী তড়িতই হোক্—যে কোন উৎস থেকেই আসুক না কেন তারা— প্রকৃতিতে তারা অভিন্ন। তাদের ধর্ম এক।

ফ্যারাডে এরপর অ্যাসিড মেশানো জলের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ পরিচালনা করলেন। তার ফলে উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করে মেপে দেখলেন যে,—নির্গত হাইড্রোজেনের ওজনগত পরিমাণ, তড়িৎপ্রবাহের সমানুপাতিক। তড়িৎ বিশ্লেষণের আরও কয়েকটি পরীক্ষা ক'রে ফ্যারাডে অবশেষে তড়িৎ বিশ্লেষণের দু'টি সূত্র আবিষ্কার করে ফেললেন।

আবার তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে নতুন নতুন নাম ব্যবহারের প্রয়োজন হলো ফ্যারাডের। এ ব্যাপারে তিনি তখন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক 'উইলিয়াম হেওয়েল'-এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। অধ্যাপক হেওয়েল তখন ক্যাথোড,

অ্যানোড, ইলেকট্রোড, আয়ন প্রভৃতি নামগুলি ঠিক ক'রে দিলেন। আজও 'তড়িৎ বিশ্লেষণ' অধ্যায় পড়বার সময় বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের এই সব নামের অর্থ বুঝতে হয়।

শিক্ষানবীশী জীবন থেকে শুরু ক'রে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ফ্যারাডে নিয়মমাফিক খুব সুন্দরভাবে কাজ করতেন। তাঁর প্রতিটি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের বিবরণ একটি খাতায় ক্রমিক নম্বর দিয়ে লিখে রাখতেন। তাঁর সেই খাতার সর্বশেষ নম্বরটি ছিল ১৬,০৪১ ; এই নম্বর দেখেই বোঝা যায় যে ফ্যারাডে জীবনে কতো পরীক্ষা-নিরীক্ষাই না করেছিলেন !

গণিতে পারদর্শী ছিলেন না ফ্যারাডে। তাই বিজ্ঞানের সব বিষয়কে তিনি দৃশ্যমান ক'রে বুঝতে ও বোঝাতে চাইতেন। নানা-রকম মডেলের সাহায্যে তিনি তড়িৎ ও চুম্বকের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতেন।

'তড়িৎ বিশ্লেষণ' নিয়ে কাজ করার পর ফ্যারাডে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর 'বিস্মৃতি রোগ' দেখা দেয়। এ সময় কোন কিছু তিনি মনে রাখতে পারতেন না। তাছাড়া দারুণ মানসিক অস্থিরতাও অনুভব করতেন। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে ন'-মাস বিশ্রাম নেন। তারপর দেশে ফিরে এসে ১৮৪১ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত চার বছর পূর্ণ বিশ্রাম নেন। তার ফলে ফ্যারাডে রোগমুক্ত হন ও নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পান। আবার পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে যান।

এরপর একটানা দীর্ঘকাল কাজ করে ১৮৬৫ সালে ফ্যারাডে রয়্যাল ইনস্টিট্যুশন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের রাণী 'ভিক্টোরিয়া' তাঁকে 'হ্যামটন কোর্টে' একখানি বসতবাড়ি দান করেন। সেই বাড়িতেই ফ্যারাডে অবসর জীবন যাপন করতে থাকেন।

শেষ জীবনে ফ্যারাডে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের উপর অনেকগুলি ছোটখাট পরীক্ষা চালান এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

তিনি ন্যাপথালিন ও সালফিউরিক অ্যাসিডের 'সালফোনেশন বিক্রিয়া' অনুধাবন করেন, কোলয়েড কণা ও রবারের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয় করেন ও বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ পরিবহনের ফলাফল নির্ধারণ করেন। আবার তিনিই প্রথম 'তড়িৎ রাসায়নিক সারি' রচনা করেন।

আজীবন বিজ্ঞান সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ ফ্যারাডেকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাব আনা হয়, কিন্তু সে প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যান করেন রয়্যাল সোসাইটির সভাপতির পদও। অবসর গ্রহণের পর বৃটিশ সরকার তাঁকে বার্ষিক তিনশো পাউণ্ড করে পেনশন মঞ্জুর করেছিলেন কিন্তু অর্থ বা যশ কোনটির প্রতিই তাঁর আসক্তি ছিল না। তিনি মনে করতেন যে মানুষ তাঁর প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছে, সেইটাই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১৮৬৭ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখে ৭৭ বছর বয়সে হ্যামটন কোর্টের বাসভবনে মাইকেল ফ্যারাডে দেহত্যাগ করেন। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় 'হাইগেট' সমাধিক্ষেত্রে এবং তাঁরই ইচ্ছানুসারে সেই সমাধির উপর স্থাপন করা হয় সাধারণ একটি স্মৃতি ফলক।

ফ্যারাডের নামকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্যে বিজ্ঞানীরা তড়িৎ পরিমাপক একটি এককের নাম রাখলেন 'মাইক্রোফ্যারাড'। আবার তড়িতের পরিমাণ ব্যক্ত করবার বৃহত্তর এককের নাম রাখা হলো 'ফ্যারাডে'। রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনের দোতালায় ওঠার সিঁড়ির এক পাশে স্থাপন করা হলো ফ্যারাডের মর্মর মূর্তি।

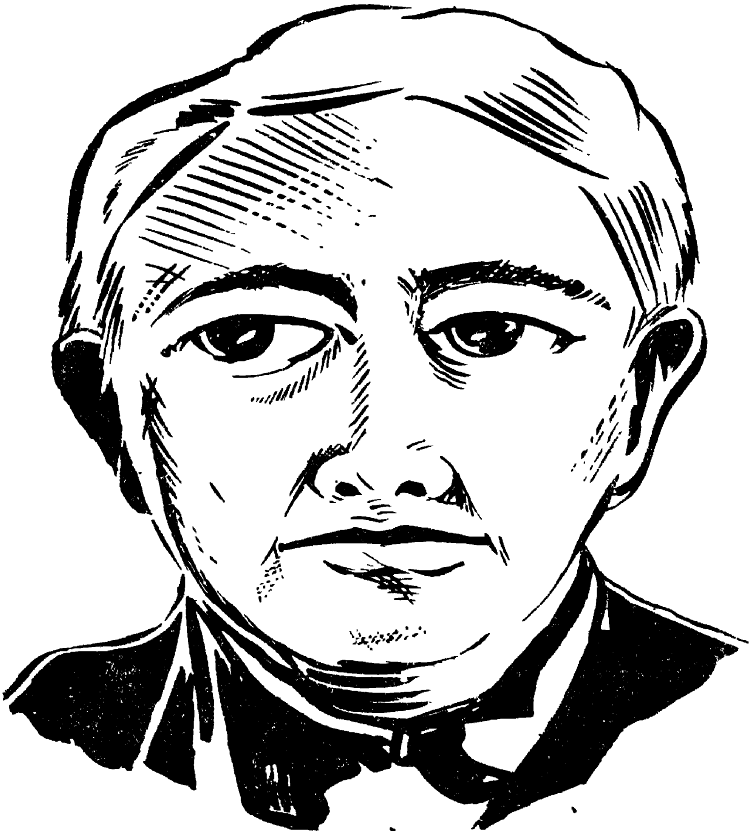
মানুষ আজও ফ্যারাডেকে স্মরণ করে বিশ্বের একজন সেরা বিজ্ঞানীরূপে।

বিজ্ঞান সাধক এডিসন

উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অদম্য মনোবল, সঠিক চিন্তাশক্তি ও কঠোর অধ্যবসায়—এই চারটি গুণ হলো কর্মে মানুষের সাফল্যের চাবিকাঠি।

—এই গুণগুলি আয়ত্ব করতে পারলে মানুষ যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে তারই জ্বাজ্জ্বল্য প্রমাণ 'টমাস আলভা এডিসন'।

এডিসনের জীবনী তাই চিরকাল মানুষকে মহৎ কাজে প্রেরণা জোগায়, অসাফল্যের মাঝেও নিরাশ না হ'য়ে নতুন উদ্যমে কাজ করে যেতে শেখায়।



বিজ্ঞান সাধক এডিসন

॥ এক ॥

ছোট্ট ছেলে আলভা বিষণ্ণ মুখে সেদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে এলো। পকেটে তার একখানি চিঠি। চিঠিখানি তার মায়ের উদ্দেশ্যে লেখা। লিখেছেন স্কুলের এক শিক্ষক। সেই চিঠির বিষয়বস্তু এই রকম ঃ

আপনার পুত্র আলভা অত্যন্ত বোকা ছেলে। এমন ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

ছেলেটির পুরো নাম 'টমাস আলভা এডিসন'।

এডিসন ভেবেছিল যে চিঠিখানি পড়ে তার মা তাকে খুব বকবেন, হয়তো বা প্রহারও করবেন। কিন্তু না. মা তাকে বকলেন না, বা মারলেন না। বরং তার পিঠ চাপড়ে বললেন, চিন্তা কোরো না বাছা—বাড়ীতে আমিই তোমাকে পড়াব।

তাই হলো।

মা বাড়ীতে বসেই তাকে পড়াতে লাগলেন। ইতিহাস, ভূগোল. অংক ও ইংরেজী সাহিত্য। আবার 'বিজ্ঞান' বিষয়টি পড়িয়েই ক্ষান্ত হলেন না মা। বিজ্ঞানের নানারকম পরীক্ষা নিজে ক'রে

সত্য-মিথ্যা যাচাই ক'রে নিতে উৎসাহ দিলেন।

ছোট্ট ছেলে আলভা আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের মতো নয়। সব বিষয় জানার, বোঝার ও শেখার আগ্রহটা তার অন্যান্য ছেলেদের চাইতে বেশী।

বাড়ীতে মা ছেলেকে সাবধান ক'রে দেন। বলেন: রান্নাঘরে গিয়ে ছোটাছুটি কোরো না বাছা। সেখানে জ্বলন্ত চুল্লী আছে। জামা কাপড়ে আগুন লাগলে আর বাঁচবে না।

মায়ের কথা শুনে আগুনের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছে হয় আলভার। ছ' বছরের ছেলেটি একদিন চুপিসারে তাদের বাড়ি সংলগ্ন খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়। শুকনো খড়ের আগুন নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। আগুন নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হাত পোড়ে আলভার।

আগুন দেখে ছুটে আসেন বাবা ও মা। অতি কষ্টে আগুন নেভান তাঁরা। দুষ্টু ছেলেটিকে বাবা রাগের মাথায় উত্তম মধ্যম প্রহার করেন। মা খুব বকেন। আলভার তাতেও শিক্ষা হয় না। হাতে কলমে পরীক্ষা ক'রে না দেখে কোন কিছুকেই সত্যি বলে মেনে নিতে চায় না সে।

বাড়ীর সামনে বাগান।

কতো পাখির আনাগোনা সেখানে।

বালক আলভা বসে বসে দেখে পাখিদের বিচিত্র গঠন, বিচিত্র চালচলন।

সে লক্ষ্য করে—পাখিরা পোকামাকড় ঠুকরে ঠুকরে খায়।

আলভা ভাবে পোকামাকড় খায় বলেই পাখিরা বোধহয় অমন সুন্দর উড়তে পারে। পোকামাকড় খেলে মানুষও নিশ্চয়ই তাহলে উড়তে পারবে।

অনুমানটা সত্যি কিনা তা যাচাই করার ইচ্ছে হয় আলভার।—

একদিন সে বাগান থেকে কিছু পোকামাকড় সংগ্রহ ক'রে আনে। নুড়ি দিয়ে সেগুলি পিষে জল দিয়ে সরবৎ বানায়। তারপর ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ীর ঝিকে সে সরবৎ খাওয়ায়।

বোকা ঝি সেই সরবৎ খেয়ে উড়তে তো পারেই না, উপরন্তু বমি ক'রে তবে বাঁচে।

মায়ের কানে যায় কথাটা।

ছেলে সত্যি কথাই বলে।

ভাগ্যিস ঝি অসুস্থ হয়ে পড়ে নি, নইলে বেদম প্রহার খেতে হতো আলভাকে। শুধু বকুনির ওপর দিয়েই সে যাত্রায় সে রক্ষা পায়।

বাড়ীতে মুরগী পোষা হতো।

বালক আলভা লক্ষ্য করতো যে মুরগী ডিমের ওপর বসে তাতে তা দেয়। তবেই ডিম ফুটে একদিন বাচ্চা বেরোয়। মুরগীর মতো অমনিভাবে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাবার ইচ্ছে হয় আলভার।

যেমন ইচ্ছা, তেমনি কাজ।

একদিন এক ডজন ডিমের ওপর আলভা বসে পড়ে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে।

—বাচ্চা তো ফুটলোই না, উপরন্তু ডিমগুলি ফেটে গিয়ে আলভার পরনের প্যান্টটা গেলো নষ্ট হ'য়ে। আর এই পরীক্ষা করার জন্যে ক্ষুদে বিজ্ঞানীর কপালে সেদিন আবার জুটলো আর এক দফা প্রহার।

তাতেও শিক্ষা হয় না আলভার।

সত্যতা যাচাই না ক'রে কিছুই সত্যি বলে মেনে নিতে মন চায় না তার। পরীক্ষা বিফল হয় হোক। তাতে নিরুৎসাহিত না হ'য়ে বার বার পরীক্ষা করে সে। বিফলতাই তাকে নিত্য নূতন পরীক্ষার প্রেরণা জোগায়। বালকের দৃঢ় বিশ্বাস—অসাফল্যের মধ্যে দিয়েই একদিন না একদিন সে সাফল্য অর্জন করবে।—ভারী বিচিত্র স্বভাবের ছেলে এই আলভা।



এডিসন ও তার মা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যে 'মিলান' নামে এক সুন্দর গ্রাম আছে। সেই গ্রামে পাহাড়ের নীচে এক কুটিরে ১৮৪৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে টমাস আলভা এডিসনের জন্ম হয়। বাপের নাম স্যামুয়েল এডিসন, মায়ের নাম ন্যান্সি। স্যামুয়েল এডিসন ছিলেন দৃঢ়চেতা, সৎ ও সুপুরুষ। কাঠের ব্যবসা ছিল তাঁর। মিলানের লোকেরা তাঁকে খুব খাতির করতো।

বাড়ীর সামনে একটি নদী। খাল কেটে এই নদীর সঙ্গে সংযোগ সাধন করা হয়েছে হুরন নদীর। ব্যবসায়ীরা দূর দূরান্তর থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে ক'রে বস্তা বোঝাই পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসে এই খালের ধারে। জলপথে নৌকাযোগে সেই সব পণ্যসামগ্রী আবার চালান যায় অন্যত্র।

লাল রঙের ছোট্ট বাড়ীর দাওয়ায় বসে বালক আলভা দেখে—খালের ধারে বণিকদের কর্মব্যস্ততা। দেখে নৌকায় মাল ওঠানো ও নামানোর দৃশ্য। দেখে—কতো রকমের মানুষ ও পণ্যদ্রব্যের আনাগোনা।

বালক এ সব দেখে আর ভাবে।

ভাবে কোথা থেকে এ সব জিনিস আসছে, কোথায় যাচ্ছে আর কেনই বা যাচ্ছে ?—সামনে যাকে দেখে, তাকেই প্রশ্ন করে : কোথা থেকে আসছ ভাই তুমি ? তোমার গাড়ীতে বস্তা বোঝাই ঐ জিনিস-গুলি কি ? কোথায় পাঠাবে এ সব জিনিস ?—কেউ উত্তর দেয়, কেউ বা দেয় না।

অহরহ প্রশ্ন করার অভ্যাস ছিল বলে কম বকুনি খেতে হতো না ছেলেটিকে। স্কুলে মাষ্টার মশাইরা তার প্রশ্নবাণে জর্জরিত হ'য়ে তাকে বকুনি দিতেন। সে যখন বকুনি খেতো তখন সহপাঠী বন্ধুরা হাসতো, বিদ্রূপ করতো।

আবার প্রশ্ন করার এই অভ্যাসের জন্যেই আলভা স্কুলের মাষ্টার

মশাইদের বিরাগভাজন হয়। আর তারই পরিণতি স্বরূপ, মাত্র আট বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে মায়ের কাছে বসে লেখাপড়া শিখতে সে বাধ্য হয়।

দেহের তুলনায় আলভার মাথাটি ছিল একটু বড়। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার দেখে বলেছিলেন: মনে হয় এ ছেলের মাথার গোলমাল হবে। গ্রামের লোকেদের কানে গেলো কাথাটা। তারাও হাতুড়ে ডাক্তরের কথায় সায় দিলো। বললো: তাই তো বলি, একরত্তি ছেলে এতো প্রশ্ন করে কেন? 'জানি না' বললেও নিস্তার দেয় না। পাল্টা প্রশ্ন করে: কেন জান না? মাথার গণ্ডগোল না থাকলে এমন কি কেউ করে?

সব কিছু জানবার ও বুঝবার এই যে অদম্য কৌতূহল, এর জন্যেই হয়তো আলভা পরবর্তী জীবনে হ'তে পেরেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত এক আবিষ্কর্তা।

যাই হোক, স্কুল ছাড়ার পর ছ' বছর ধরে আলভা মায়ের কাছে বাড়ীতে বসেই লেখাপড়া শেখে। তার লেখাপড়ার ব্যাপারে বাবা স্যামুয়েল এডিসনের উৎসাহও কম ছিল না। স্যামুয়েল তাকে বলতেন: অ্যাল, তুমি বই পড়া অভ্যাস কর। পাঠ্য বই ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান্ ধরনের বই পড়। যত বেশী বই পড়বে, তত বেশী তোমার জ্ঞান বাড়বে। এক একটি বই পড়ে শেষ করার জন্যে তোমাকে বই পিছু আমি পঁচিশ সেণ্ট ক'রে (এক সেণ্ট আমাদের দেশের প্রায় দেড় টাকার সমান) উপহার দেব।

টাকা রোজগারের এই লোভ সামলাতে পারতো না আলভা। নিত্য নতুন বই পড়ে শেষ করতো সে। প্রতিটি বই পড়ে কতটুকু কি শিখেছে ছেলে, বাপ স্যামুয়েল তা পরীক্ষা করতেন। তারপর তাকে দিতেন প্রতিশ্রুত অর্থ। এমনিভাবে বই পড়ে অনেক অর্থ উপার্জন করতো বালক আলভা।

স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তি—দুইই প্রখর ছিল আলভার। বইতে একবার যা পড়ে তাই তার মনে গেঁথে যায়।

কাঠুরিয়ারা বনে গিয়ে কাঠ কাটে। ভারী ভারী কাঠের গুঁড়ি ঘাড়ে ক'রে বয়ে নিয়ে যায় পথ দিয়ে। বাড়ী ফেরার পথে মনের আনন্দে তারা গান গায়। বালক আলভা বাড়ীর বারান্দায় বসে তাদের দেখে, তাদের গান শোনে। মুখস্থ ক'রে ফেলে গানের বাণী ও সুর। বাড়ীতে বসে বালক আলভা গান গাইতে ভয় পায়—পাছে মা বাবা বকেন। তাই বাড়ীর বাইরে গিয়ে তারস্বরে সে কাঠুরিয়াদের কাছ থেকে শেখা গান গায়।

পড়তে বসে বইয়ের অনেক প্রশ্ন নিয়ে বালক মাথা ঘামায়। মাথায় তার এক রাশ বড় বড় চুল। যতই চিন্তা করে ততই বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলি চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চুলগুলিকে অবিন্যস্ত করতে থাকে।—ক্রমে এটা তার স্বভাবে বা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়।

ছেলের এই বদ অভ্যাস দূর করার জন্যে স্যামুয়েল এডিসন একদিন নাপিত ডেকে ছেলের মাথার চুলগুলি খুব ছোট ক'রে ছাঁটিয়ে দিলেন। ছেলে কিছু বললো না। কিন্তু মা ন্যান্সি তাতে বিরক্ত হলেন। মাথার ঐ এক রাশ চুল ছেলের সৌন্দর্য বাড়িয়েছিল —এই ছিল তাঁর ধারণা।

আগেই বলেছি যে হাতে-কলমে পরীক্ষা করতে বড় ভালবাসতো আলভা। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গেলে যন্ত্রপাতি দরকার। দরকার নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য। এই সব কিনতে গেলে অর্থ চাই।—বালক আলভা বই পড়ে এই অর্থ তার বাবার কাছ থেকে সংগ্রহ করতো।

দুই

১৮৫৪ সালে স্যামুয়েল এডিসন 'মিলান' ছেড়ে সপরিবারে চলে এলেন মিচিগানের পোর্ট হুরন-এ। এখানে এসে তিনি কাঠ ও দানা শস্যের পাইকারি ব্যবসা শুরু করলেন। শাক সবজী ও ফল চাষও করতে লাগলেন। বাগানের ফল ও সবজী স্থানীয় বাজারে বিক্রি ক'রে বেশ ভালই উপার্জন করতে লাগলেন।

আলভার বয়েস তখন মাত্র আট বছর। কিন্তু সব কাজেই তার অদম্য উৎসাহ। নিজে হাতে বাগানে সে সবজী চাষ করে। বাগানের ফসল ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে।

স্যামুয়েল এডিসনের মাথায় এক অভিনব পরিকল্পনা আসে। এই সময় তিনি প্রতিবেশীদের সাহায্যে নিজের বাড়ীর কাছে কাঠের একটা মস্ত উঁচু স্তম্ভ তৈরি করেন। পেঁচালো সিঁড়ি বেয়ে শতাধিক ফিট উঁচু সেই স্তম্ভের মাথায় ওঠারও ব্যবস্থা রাখেন।

বালক আলভা পোস্টার লিখে সারা শহরে বিলি ক'রে বেড়ালো। পোস্টারে সেই স্তম্ভ বা মিনারের উদ্বোধনের দিন ও সময় লেখা ছিল। পঁচিশ সেন্ট মূল্যের টিকিট কাটলে যে কোন লোককেই

মিনারের চূড়ায় উঠতে দেওয়া হবে—পোস্টারে এ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া ছিল। কেন লোকে এই মিনারে উঠবে ?—তাও ঘটা ক'রে পোস্টারে লেখা হলো।—লেখা হলো, এই স্তম্ভের চূড়ায় উঠে পোর্ট হুরন শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করুন। এ সুযোগ হারালে পস্তাতে হবে।

প্রচারপর্ব শেষ করলো আলভা।

স্থানীয় অধিবাসী কেন, আশপাশের অনেক গ্রামের মানুষেরও কানে এলো কথাটা।

কাতারে কাতারে লোক আসতে লাগলো অভিনব এই মিনারটি দেখতে। তার উপরে উঠতে।

বালক আলভা দর্শকদের টিকিট বিক্রি করতে লাগলো। প্রথম দিনের শেষে লাভ হলো তিন ডলার। বেশ কিছুদিন এই মিনারে খুব দর্শক সমাগম হতে লাগলো। তারপর এর আকর্ষণ গেলো কমে।

নিত্যনূতন পরিকল্পনা ও অর্থ উপার্জনের অভিনব প্রচেষ্টা—এ দু'টো গুণই আলভা পেয়েছিল তার বাবা স্যামুয়েল এডিসনের কাছে।

বাপ-মায়ের সাত সন্তানের মধ্যে আলভাই সবার ছোট। বড় ভাই-বোনেরা বয়সের দিক থেকে কেউই আলভার সঙ্গে খেলার উপযোগী নয়। আবার স্কুলে পড়াও ভাগ্যে নেই যে স্কুলের সহপাঠী বন্ধু জুটবে খেলার জন্যে। ছোট ছেলেটি তাই অনন্যোপায় হ'য়ে বই পড়ে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েই সময় কাটায়।

মায়ের কাছে বসে আলভা শেখে গ্রীক ভাষা, রোমান ভাষা, পৃথিবীর ইতিহাস। বার্টন রচিত বিজ্ঞান অভিধান পড়তে খুব ভাল লাগে তার। তাছাড়া ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের জীবনী, শেক্সপীয়রের রচনা, এমন কি বাইবেল পর্যন্ত পড়ে শেষ করে বালক আলভা। পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের নাম, তাদের আবিষ্কারের পরিচয়—এই বয়েসেই তার কণ্ঠস্থ। বন্ধুদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা

গল্প শুনিয়ে আলভা তাক্ লাগিয়ে দেয়।

দশ বছর বয়েসের ছেলেমেয়েরা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়তে ভালবাসে। কিন্তু এই ছেলেটি এর ব্যতিক্রম। এ দশ বছর বয়েস থেকেই পড়ে রসায়ন, গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের দুরূহ সব বই। বাড়ীতে নিজে হাতে গড়া পরীক্ষাগারে বসে বসে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালায়। তাতে জ্ঞান বাড়ে। তত্ত্বের সঙ্গে তার প্রয়োগের মিলনে শিক্ষাটা হয় পাকাপোক্ত।

বাড়ীর পরীক্ষাগারে নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। বই পড়ে বাবার কাছ থেকে পাওয়া অর্থে কুলোয় না আর। আলভা তাই এই বয়েসেই চাকরির সন্ধান করতে থাকে।

কিন্তু চাকরি চাই বললেই তো আর পাওয়া যায় না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আলভা ঠিক করে যে সে ট্রেনে খবরের কাগজ, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি ফেরি ক'রে অর্থ উপার্জন করবে এবং সেই অর্থে মেটাবে তার জ্ঞানস্পৃহা।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলপথে তখন রোজ ট্রেন চলতো। একটি ট্রেন ডেট্রইট থেকে রোজ সকাল সাতটায় ছাড়তো। যেতো মিচিগান সিটির পোর্ট হুরন পর্যন্ত। তারপর সেই ট্রেনটি রাত ন'টায় আবার ফিরে আসতো ডেট্রইটে। ৬৩ মাইল যাতায়াতে মোট সময় লাগতো চৌদ্দ ঘণ্টা।

বারো বছরের ছেলে রোজ এতোটা পথ ট্রেনে যাতায়াত করবে, প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা ক'রে বাইরে কাটাবে—এটা বাপ-মায়ের পছন্দ নয়। তাঁরা ছেলেকে নিষেধ করেন ঐ কাজ করতে। কিন্তু আলভা বড় একগুঁয়ে ছেলে। সৎপথে থেকে রোজগার করবেই সে—এই তার জেদ। সে অনেক যুক্তি দিয়ে মা-বাবাকে বোঝায়। বলে, 'এতে আমার ডবল লাভ হবে। প্রথমতঃ রোজগার ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখব। তাছাড়া পোর্ট হুরনে পাওয়া যায়—এমন

সব বইই আমার পড়া হ'য়ে গেছে। শুনেছি ডেট্রইট শহরে খুব বড় একটা লাইব্রেরী আছে। ট্রেন যোগে সেখানে পৌঁছে ফিরতি ট্রেন ধরার আগে আমি ছ' ঘণ্টা সময় পাব হাতে। ঐ সময়টুকু আমি লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়ে কাটাব। এটা হবে আমার দ্বিতীয় লাভ।'

সুন্দর ও অকাট্য যুক্তি।

অগত্যা বাপ-মা আলভাকে ঐ কাজ করতে অনুমতি দেন। ট্রেনে ফেরিওয়ালারূপে শুরু হয় টমাস আলভা এডিসনের প্রথম কর্মজীবন।

এডিসন মিষ্টভাষী ছেলে। রসিকও বটে।

ট্রেন যাত্রীদের সঙ্গে মিষ্টিমুখে হেসে কথা বলে ও রসিকতা করে সে। এই সব গুণের জন্যে দেখতে দেখতে তার ফল, স্যাণ্ডউইচ ও খবরের কাগজ—সব বিক্রি হ'য়ে যায়। প্রথম দিনের শেষে পাঁচ ডলার লাভ হয় তার।

রাতে ঘরে ফিরে আসে এডিসন। ছেলের কর্মজীবনের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা শুনবার জন্যে তার বাপ-মা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। রাতে খাবারের টেবিলে বসে এডিসন তার সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা শোনালো মা-বাবাকে। তারপর বেশ গর্বের সঙ্গেই জানালো যে সে প্রথম দিনেই পাঁচ ডলার লাভ করেছে। লাভের অর্থ থেকে এক ডলার সে মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললো: এবার থেকে রোজ তোমাকে একটি ক'রে ডলার উপহার দেব, বুঝলে মা?

মায়ের মন আনন্দে ভরে ওঠে।

ছেলে এডিসন তার প্রতিশ্রুতি রাখে।

সত্যিই প্রতিদিন একটি করে ডলার মাকে উপহার দিতে থাকে সে।

ট্রেনে হরেক রকম লোকের আনাগোনা। কাগজ ফেরি করতে

গিয়ে হরেক রকম মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। লোক-চরিত্র অনুধাবন করার সুযোগ হয়। তাতে অভিজ্ঞতা বাড়ে। জীবনে সেটাও মস্ত লাভ।

একদিনের ঘটনা বলি।

সেটা ১৮৬০ সাল।

দুই সুদর্শন যুবক তাঁদের এক নিগ্রো চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ডেট্রইট স্টেশনে ট্রেনে চাপলেন। যাবেন পোর্ট হুরনে। আলভাও ট্রেনে উঠলো কাগজ ফেরি করতে।

ওঁদের মধ্যে একজন আলভাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন: খোকা, কি আছে তোমার কাছে?

—খবরের কাগজ। জবাব দিল আলভা।

—দাও দেখি যে ক'খানা কাগজ আছে।

কাগজগুলি হাতে নিয়ে ভদ্রলোক ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে সহযাত্রীকে বললেন: 'নিকোডেমাস', ছেলেটিকে কাগজগুলির দাম মিটিয়ে দাও তো।—নিকোডেমাস দাম দিয়ে দিলেন। আলভাও চলে গেলো। কামরার অন্যান্য যাত্রীরা এই অস্বাভাবিক কাণ্ডটি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন।

এদিকে ট্রেনের অন্য এক কামরায় আলভা তার ফেরির মালপত্তর রাখতো। সেখানে কিছু অবিক্রীত খবরের কাগজ, মাসিক পত্র ইত্যাদি পড়ে ছিল। আলভা সেগুলিকে তুলে নিয়ে আবার এলো সেই কামরায়। আবার হাঁকতে লাগলো: খবরের কাগজ চাই—খবরের কাগজ। চাই ভালো ভালো পত্র-পত্রিকা।

এবারও সেই অজ্ঞাত পরিচয় যাত্রী আলভার কাছ থেকে যাবতীয় পত্র-পত্রিকা কিনে নিয়ে কামরার বাইরে ফেলে দিলেন।

এডিসন খুশী মনে ফিরে গেলো। কপালটা আজ তার সত্যিই ভালো, নইলে সেদিনের তো বটেই, পুরনো অবিক্রীত পত্র-পত্রিকা-

গুলিই বা কেন নিমেষে এমনিভাবে বিক্রি হয়ে যাবে!

আলভা কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তেও ঐ অস্বাভাবিক আচরণের কোন কারণ খুঁজে পায়নি।

পড়াশুনা হচ্ছে, ভাল রোজগারপাতিও হ'চ্ছে, কিন্তু হচ্ছে না কেবল একটি জিনিস। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ ও সময় হচ্ছে না। কি করলে সেটাও সম্ভব হয় তা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আলভার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

যে ট্রেনে আলভা রোজ যাতায়াত করতো, সেই ট্রেনে গার্ডের কামরার পাশে ছোট্ট একটুকরো খালি জায়গা পড়ে ছিল। যাত্রীদের ধূমপানের জায়গা সেটা; কিন্তু যাত্রীরা কেউই সেখানে আসতেন না।

গার্ড সাহেবকে বলে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে এডিসন সেখানে একটি ছোটখাটো পরীক্ষাগার গড়ে তুললো। রাসায়নিক দ্রব্যভরা অনেক শিশি-বোতল, স্পিরিট ল্যাম্প ও হরেক রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে সে পরীক্ষাগারটি সাজালো। ফেরি করার কাজ শেষ ক'রে এডিসন সেখানে বসে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতে লাগলো।

টেলিগ্রাফিতে এডিসনের খুব আগ্রহ ছিল। সেই সূত্রে টেলিগ্রাফ অপারেটরদের অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় হলো। পরিচয়টা শেষে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হলো।

এডিসন লক্ষ্য করলো যে অনেক লোক বিভিন্ন স্টেশনে আসে খবরের কাগজ কিনতে। কখন ট্রেন আসবে, এডিসনের কাছ থেকে খবরের কাগজ কিনতে পাওয়া যাবে, এই আশায় তারা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করতো।—এটা লক্ষ্য ক'রে এডিসনের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রধান প্রধান খবরগুলোর সারাংশ তৈরি করে ফেলতো। তারপর রেলের টেলিগ্রাফ অপারেটরদের অনুরোধ করতো—ঐ সংবাদ-সার টেলিগ্রাফ ক'রে স্টেশনে স্টেশনে জানিয়ে দিতে।

টেলিগ্রাফ অপারেটররা খুব ভালবাসতো এডিসনকে। তারা এডিসনের অনুরোধ রক্ষা করতো। টেলিগ্রামের মাধ্যমে পাওয়া সেই সংবাদ-সার স্টেশন মাষ্টারেরা প্ল্যাটফরমে একটা ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে দিতেন। তা সাধারণ মানুষের মধ্যে খবরের কাগজ পড়ার আগ্রহ জাগাতো। বেশী সংখ্যক মানুষ প্রতিদিন খবরের কাগজ কেনার জন্যে বিভিন্ন স্টেশনে জড়ো হতো। কখন ট্রেন আসবে ও এডিসনের কাছ থেকে খবরের কাগজ কিনতে পাওয়া যাবে—এই আশায় তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। ফলে স্টেশনে ট্রেন পৌছানো মাত্রই এডিসনের খবরের কাগজগুলি হুস-হুস করে বিক্রি হয়ে যেতো। রোজই তার বিক্রি বাড়তো, লাভের অঙ্কও বাড়তো।

খবরের কাগজের প্রতি খরিদ্দারদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে দেখে চতুর এডিসনের মাথায় আর একটা বুদ্ধি এলো। সে নিজেই একটা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ প্রকাশে উদ্যোগী হলো।

লাভের পয়সা দিয়ে একটা ছোট 'প্রিন্টিং মেশিন' কিনে এনে ট্রেনে তার পরীক্ষাগারেরই এক পাশে বসালো। তারপর 'সাপ্তাহিক হেরাল্ড' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলো। পত্রিকার সংবাদ সংগ্রহ করা, পত্রিকা সম্পাদনা করা, কম্পোজ করা, ছাপা—সব কাজ এডিসন একাই করতে লাগলো। 'সাপ্তাহিক হেরাল্ড'-এর কাটতিও নেহাৎ কম হলো না।

একবার এক ইংরেজ পর্যটক ঐ ট্রেনে যাচ্ছিলেন। পনের বছরের একটি ছেলেকে চলন্ত ট্রেনে বসে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে দেখে ভদ্রলোক খুব অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তখনই এডিসনের এই অভিনব কীর্তির কথা লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদককে জানালেন।—অল্প দিনের মধ্যেই টাইমস্ পত্রিকায় এডিসনের কৃতিত্বের কাহিনী ফলাও করে প্রকাশ করা হলো। চলন্ত ট্রেন থেকে সাপ্তাহিক খবরের কাগজের প্রকাশ—অভিনব তো বটেই, বিস্ময়করও।

॥ তিন ॥

একদিন ট্রেন এসে দাঁড়ালো 'মাউন্ট ক্লিমেন্স' স্টেশনে। সেখানকার কয়েকটি মালবাহী ওয়াগন ট্রেনের সঙ্গে জোড়া হবে।

এডিসন ট্রেন থেকে সবে প্ল্যাটফর্মে নেমেছেন তখন। এমন সময় তাঁর চোখ পড়লো একটি শিশুর দিকে। শিশুটি রেল লাইনের ওপর বসে পাথর কুড়োচ্ছে।

দেখতে দেখতে বিশালকায় ওয়াগন দু'টি গড়িয়ে এলো লাইনের ওপরে।—এডিসন তাঁর হাতের খবরের কাগজের বাণ্ডিলটা ফেলে দিলেন মাটিতে। তড়িৎ গতিতে রেল লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোঁ মেরে শিশুটিকে তুলে আনলেন নিরাপদ স্থানে। আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি করলেই শিশুটি চাকার তলায় কাটা পড়তো।

ছেলেটি ঐ স্টেশনেরই টেলিগ্রাফ অপারেটরের। টেলিগ্রাফ অপারেটর 'ম্যাকেঞ্জি' কিভাবে এডিসনকে যে কৃতজ্ঞতা জানাবেন তা ভেবে পেলেন না। নিখরচায় এডিসনকে তিনি টেলিগ্রাফি শেখাতে চাইলেন। এডিসন সানন্দে সে প্রস্তাবে রাজি হলেন।

স্থির হলো আলভা সপ্তাহে চারদিন করে ম্যাকেঞ্জির কাছে যাবেন

'টেলিগ্রাফি' শিখতে। তাই হলো। আর মাত্র তিন মাসের মধ্যেই আলভা পাকা টেলিগ্রাফ অপারেটর হ'য়ে উঠলেন। শুধু তাই নয়, মাত্র দু'হপ্তার মধ্যেই তিনি টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি নিজে বানিয়ে ফেললেন। 'ম্যাকেঞ্জি' আলভার কারিগরি দক্ষতা দেখে অবাক হলেন।

এদিকে আর এক অঘটন ঘটে গেলো। একদিন এডিসন চলন্ত ট্রেনে রসায়ন বিজ্ঞানের কি একটা পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ বিষম এক ঝাঁকুনি খেতেই ফসফরাস ভর্তি একটা বোতল উল্টে পড়লো পরীক্ষাগারের মেঝেতে। বাতাসের সংস্পর্শে আসতেই ফসফরাস আপনা আপনি জ্বলে উঠলো। দুর্ভাগ্যবশতঃ মেঝের সে জায়গাটিতে কিছু কাগজের টুকরো পড়ে ছিল। জ্বলন্ত ফসফরাসের সংস্পর্শে এসে সেই কাগজের টুকরোগুলিও জ্বলে উঠলো।

ভয়াবহ সেই আগুন একলা নেভাতে না পেরে এডিসন সাহায্যের জন্যে চীৎকার করে উঠলেন। কামরার 'করিডোর' দিয়ে গার্ড সাহেব ছুটে এলেন সেখানে। তারপর উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় আগুন তো নেভানো হলো কিন্তু অগ্নিকাণ্ডে কামরাটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গার্ড সাহেব খুব রেগে গেলেন। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই তিনি এডিসনের পরীক্ষাগারের যাবতীয় জিনিসপত্র টান মেরে বাইরে ফেলে দিলেন।

গার্ড সাহেবের এই আচরণে এডিসন মনে দারুণ ব্যথা পেলেন কিন্তু নিরুৎসাহিত হলেন না। তাঁর মন থেকে রসায়নবিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও মুছে গেলো না। বরং জেদ আরও বেড়ে গেলো। নতুন করে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য কিনে এনে এডিসন তাঁর বাড়ীর চিলে কোঠায় বানালেন নতুন এক পরীক্ষাগার। কিন্তু তাতে সুবিধা হলো না। কারণ বাড়ীর সেই পরীক্ষাগারে বসে কাজ করার সময় কখন তাঁর! দিনের চৌদ্দ ঘণ্টা সময় তো বাইরেই কেটে যায়।

যাই হোক বেশিদিন আর এডিসনকে ফেরিওয়ালার কাজ করতে হয়নি। রেল কোম্পানীতেই অস্থায়ী টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজ পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। টেলিগ্রাফ অপারেটররূপে সেই রেলপথের অনেক বড় বড় শহরে তিনি ঘুরেছিলেন। পাঁচ বছর ধরে অনেক মানুষের সঙ্গে মিশে, শহরের বড় বড় লাইব্রেরীতে গিয়ে প্রচুর বই পড়ে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

অনেক গুণ ছিল এডিসনের।

তাঁর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতো চকচকে ঝকঝকে। একবার এক বন্ধুকে চিঠি লেখেন এডিসন। সেই বন্ধু এক টেলিগ্রাফ কোম্পানীতে চাকরি করতো। বন্ধুর ওপরওয়ালার হাতে গিয়ে পড়ে এডিসনের চিঠিখানি। তিনি ঐ হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হয়ে এডিসনের বন্ধুকে বলেন, 'এই ছেলেটিকে আমাদের কোম্পানীতে চাকরি দিতে পারি। ভাল মাইনে দেব আমরা। তাকে জিজ্ঞাসা কোরো—সে আমাদের কোম্পানীতে চাকরি করতে ইচ্ছুক কিনা।'

বন্ধু তার ওপরওয়ালার প্রস্তাব জানালো এডিসনকে। এডিসন সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কানাডার স্ট্রাটফোর্ডে নৈশ টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজে যোগ দিলেন।

কাজটা স্থায়ী, মাইনেও আগের চাইতে বেশী। তাছাড়া রাতে কাজ করতে হয় বলে দিনে পড়াশুনা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানোর সুবিধাও আছে। এডিসন তাই এ কাজে যোগ দিয়ে খুশীই হলেন।

যে ঘরে টেলিগ্রাফ অফিস, সেটি আগে ছিল ভোজনালয়। অজস্র আরশোলা লুকিয়ে থাকে ঘরের আনাচে কানাচে। টেলিগ্রাফ অপারেটররা রাতের খাবার সঙ্গে করে নিয়ে আসে। রাখে একটা টেবিলের ওপরে। আর অমনি শুরু হয়ে যায় আরশোলাদের উৎপাত। দলে দলে আরশোলা উঠে আসে টেবিলের ওপরে খাবারের আশায়। সে এক বিশ্রী ব্যাপার!

সহকর্মীরা এডিসনকে বললো: ভাই এই আরশোলাগুলোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় বের কর না।

এডিসন মুখে কিছুই বললেন না। কিন্তু তার পরদিন রাতে যখন তিনি কাজে এলেন তখন সঙ্গে করে নিয়ে এলেন লম্বা একটি টিনের পাত। টিনের পাতটিকে তিনি সরু ও লম্বা দু'ফালি করে কেটে ফেললেন। তারপর টেবিলের ওপরে টিনের ফালি দু'খানি সমান্তরাল করে বিছিয়ে দিলেন। একটা আর একটা থেকে একটু দূরে রইলো।

এরপর এডিসন একটা শক্তিশালী ব্যাটারির দুই মেরুপ্রান্তের সঙ্গে টিনের ফালি দু'খানি সংযুক্ত করে দিলেন। টেবিলের ওপরে টেলিগ্রাফ অপারেটরদের খাবার আঢাকা অবস্থায় রাখা হলো।

একটু বাদেই যথারীতি আরশোলারা টেবিলের পায়া বেয়ে একে একে ওপরে উঠে এলো। টিনের একটা পাতে পা রেখে একটু এগুতেই অপর পা-খানি স্পর্শ করলো দ্বিতীয় পাতটিকে। ব্যস্, আর যায় কোথা। তড়িৎবর্তনী সম্পূর্ণ হওয়ায় তড়িতাহত হ'য়ে একটি আরশোলা মারা পড়লো। এমনিভাবে একটির পর একটি আরশোলা এডিসনের যান্ত্রিক ফাঁদে পা দিয়ে মরতে লাগলো।—সহকর্মীরা এই মজার দৃশ্য দেখে এডিসনের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলো। আর এডিসন?—তিনি একটু গর্বের হাসি হেসে বুঝিয়ে দিলেন যে তাক্ লাগাবার মতো এমন অনেক অভিনব কৌশলই তাঁর জানা আছে!

এ হেন চতুর ছেলেটিকেও একদিন বোকা বনতে হলো। কি ভাবে, তা বলি।

একদিন সকালবেলায় রাস্তার ধারে একটা দোকানের সামনে খুব ভিড় দেখে এডিসনের কৌতূহল হলো। বন্ধু অ্যাডামস্‌কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে দোকানের সামনে মস্ত

এক বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা: তিনশো জোড়া মোজা এসেছে আজ। প্রতি জোড়া মোজার দাম মাত্র পাঁচ সেন্ট!

একটু বাদেই পাশের দোকানটির সামনে একটি নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হলো। তাতে লেখা: এখানেও মোজা পাওয়া যাবে আরও কম দামে। প্রতি জোড়া মোজার দাম মাত্র তিন সেন্ট!

দেখতে দেখতে দাম কমানোর প্রতিযোগিতা চললো দুই দোকানের মধ্যে। শেষে একটি দোকানে নোটিশ ঝোলানো হলো: তিন জোড়া মোজা পাওয়া যাবে মাত্র এক সেন্টের বিনিময়ে!

ভারী মজার ব্যাপার তো।

এডিসনের পকেটে তখন পয়সা ছিল না। বন্ধু অ্যাডামস্-এর কাছ থেকে এক সেন্ট ধার করে তিনি দোকানে ঢুকে পড়লেন। এতো সস্তায় মোজা কেনার এমন সুযোগ আর তো কখনও আসবে না।

দোকানীকে এক সেন্ট দিয়ে তিনি তিন জোড়া মোজাও পেলেন। কিন্তু প্যাকেট খুলে দেখলেন যে সেগুলি শিশুদের পায়ের মাপের মোজা!

এডিসন দোকানীকে বললেন: এ মোজা নিয়ে আমার কি হবে? আমাকে বড়দের পায়ের মাপের মোজা দিন।—দোকানীর সাফ জবাব: এতো কম দামে আমরা বাছাই ক'রে বিশেষ মাপের মোজা কাউকে দিতে পারব না।

এডিসন আর কি করবেন! অগত্যা সেই মোজাগুলি সঙ্গে নিয়েই তিনি ঘরে ফিরে এলেন।

রাত জেগে কাজ করলে দিনে বিশ্রাম নেওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু দিনের বেলার অমূল্য সময়টুকু এডিসন ঘুমিয়ে নষ্ট করতেন না। তাই রাতে কাজে বসে তাঁর ঘুম পেতো।

কিছুদিন পরে টেলিগ্রাফ কোম্পানীর কর্তারা নৈশ টেলিগ্রাফ

অপারেটররা সারারাত ঠিক মতো কাজ করে কিনা তা যাচাই করতে মনস্থ করলেন। তাঁরা হুকুমনামা বের করে নির্দেশ দিলেন ; প্রত্যেক নৈশ টেলিগ্রাফ অপারেটরকে রাতে একঘণ্টা অন্তর হেড-অপিসে একটি করে বার্তা পাঠিয়ে জানাতে হবে সে ঠিকমতো কাজ করছে কি না। ইংরেজী 'ছয়' শব্দটি 'মোর্স সংকেত'-এর মাধ্যমে এক ঘণ্টা অন্তর টেলিগ্রাফ করলেই হেড-অপিসের কর্তারা বুঝতে পারবেন যে অপারেটর জেগে আছে ও ঠিকমতো কাজ করছে।

এই হুকুমনামা পেয়ে এডিসন মহা ফাঁপরে পড়লেন। রাতে কাজ বেশী থাকে না অথচ চাকরির খাতিরে সারারাত জেগে থাকতে হবে! একি অন্যায় কথা! বুদ্ধিমান এডিসন তখনই মাথা খাটিয়ে একটা যন্ত্র তৈরি করে ফেললেন। স্বয়ংক্রিয় ঐ যন্ত্রটি ইংরেজী 'ছয়' শব্দ মোর্স সংকেত-এর মাধ্যমে টেলিগ্রাফ করতে পারতো। যন্ত্রটা যাতে ঠিক এক ঘণ্টা অন্তর কাজ করে যেতে পারে, সেজন্যে এডিসন সেটাকে একটা ঘড়ির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন। এতে বেশ মজা হলো। সারারাত এডিসন দিব্যি ঘুমুতে লাগলেন। আর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা এক ঘণ্টা অন্তর হেড-অপিসে বার্তা পাঠিয়ে কাজে এডিসনের সজাগ উপস্থিতির প্রমাণ জানাতে লাগলো।

কিছুদিন এমনিভাবে বেশ শান্তিতেই রাত কাটলো এডিসনের। তারপর কেমন যেন সন্দেহ জাগলো টেলিগ্রাফ কোম্পানীর এক কর্তার মনে। তিনি হেড-অপিসে বসে এক রাতে এডিসনের কাছ থেকে একটি বার্তা পাওয়ার পরই টেলিগ্রাফে এডিসনকে ডাকলেন। ডেকে কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। তখন তাঁর সন্দেহ আরও বেড়ে গেলো। আর দেরি না করে ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে ছুটলেন কোম্পানীর শাখা-অপিসে—যেখানে এডিসন কাজ করতেন। সেখানে পৌঁছে অবাক বিস্ময়ে ঐ অফিসারটি দেখলেন যে এডিসন গভীর ঘুমে অচেতন। আর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা এডিসনের হ'য়ে দিব্যি

সাংকেতিক বার্তা পাঠাবার কাজ করে চলেছে।

এ ঘটনা নিজের চোখে দেখে অফিসারটি তখনই হেড অপিসে ফিরে এলেন। আর তার পরের দিনই এডিসনকে চাকরিটি খোয়াতে হলো।

চাকরি যাওয়ার পর এডিসন কিছুদিন বাড়ীতেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন হয়ে রইলেন। এতদিন একটি তারের মধ্যে দিয়ে একই সময়ে একটি মাত্র টেলিগ্রাফ বার্তা পাঠানো যেতো। —বুদ্ধি খাটিয়ে এডিসন এমন একটি যন্ত্র এবার আবিষ্কার করে ফেললেন যাতে করে একটি তারের মধ্যে দিয়ে একই সময়ে দুটি টেলিগ্রাফ বার্তা পাঠানো যায়।—এ যন্ত্রটির নাম 'ডুপ্লে ট্রান্সমিটার'।

১৮৬৮ সালে এই যন্ত্রটি যখন আবিষ্কৃত হলো তখন 'জার্নাল অফ দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা এডিসনের এই কৃতিত্বের খবর ফলাও করে প্রচার করলো। তারা লিখলো—'এডিসন অসাধ্য সাধন করেছেন। এ যন্ত্র ব্যবহার করলে টেলিগ্রাফ কোম্পানীগুলির অনেক অর্থ সাশ্রয় হবে।'

এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই বিখ্যাত এক টেলিগ্রাফ কোম্পানী এডিসনকে ডুপ্লে ট্রান্সমিটার যন্ত্রের কার্যপ্রণালী পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে অনুরোধ জানালেন। পরীক্ষা সফল হ'লে তাঁরা এ যন্ত্রটি কিনবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। ঠিক হলো যে, এডিসন যাবেন নিউইয়র্ক এবং সেখান থেকে ঐ যন্ত্র মারফং বার্তা পাঠাবেন রচেষ্টারে।

রচেষ্টারে গ্রাহক যন্ত্রের কাছে রইলেন এডিসনের এক সহকারী। পরীক্ষার সময় গ্রাহক যন্ত্রে এমন এক ত্রুটি দেখা দিলো যা এডিসনের অদক্ষ সহকারী বহু চেষ্টা করেও সারাতে পারলেন না। পরীক্ষা ব্যর্থ হলো। টেলিগ্রাফ কোম্পানী 'ডুপ্লে ট্রান্সমিটার' যন্ত্র কিনলো না।

এতে এডিসন মর্মাহত হলেন বটে, তবে ভেঙ্গে পড়লেন না। শীঘ্রই যন্ত্রটিকে তিনি আবার ত্রুটিমুক্ত করে ফেললেন। যে সব বন্ধু এই যন্ত্রটি বানাতে অর্থ সাহায্য করলেন, তাঁরা বললেন 'সাবাস'।

॥ চার ॥

১৮৬৯ সাল।

এ বছর মে মাসে ভাগ্যান্বেষণে এডিসন চলে এলেন নিউইয়র্ক শহরে। এই শহরেই এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যাতে তাঁর জীবনের মোড় গেলো ঘুরে।

কাজের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে এডিসন একদিন উপস্থিত হলেন এক টেলিগ্রাফ কোম্পানীর কার্যালয়ে। এই টেলিগ্রাফ কোম্পানীর কাজ ছিল সোনার বাজার দর টেলিগ্রাফ করে বিভিন্ন শহরে জানিয়ে দেওয়া ও জেনে নেওয়া। এ জন্যে কোম্পানীর অনেকগুলি যন্ত্র ছিল। এই সব যন্ত্রে সোনার দরের ওঠা-নামা আপনা আপনি নির্দেশিত হতো। সোনা কেনা ও বেচা যাদের কারবার, তারা এই কোম্পানী মারফৎ সোনার দরের ওঠা-নামার খবর জানতে পারতো। আর এই খবর টেলিগ্রাফ মারফৎ জানিয়ে কোম্পানী লুটতো প্রচুর মুনাফা।

এডিসন যেদিন ঐ কোম্পানীর কার্যালয়ে গেলেন, সেদিন মূল যন্ত্রটি হঠাৎ বিকল হ'য়ে গেছে। কারিগরেরা বহু চেষ্টা করেও যন্ত্রটি সারাতে পারছে না। কোম্পানীর ডিরেক্টর সাহেব থেকে আরম্ভ ক'রে ছোটখাটো কর্মচারী—সবাই তখন মহাব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করছেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছেন সবাই। সবারই চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তার ছাপ।

এডিসন কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে বুঝবার চেষ্টা করলেন তার কার্যপ্রণালী। কারিগরেরা কিভাবে যান্ত্রিক ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করছে তাও ভালভাবে লক্ষ্য করলেন। তারপর এক সময় কোম্পানীর ডিরেক্টর সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন: 'আমাকে সুযোগ দিলে যন্ত্রটা সারিয়ে দিতে পারি স্যার'।

কোম্পানীর ডিরেক্টর-এর মুখে চোখে ফুটে উঠলো বিস্ময়ের চিহ্ন। এই অজ্ঞাত পরিচয় যুবকটি বলে কি! এতগুলি দক্ষ কারিগর যা পারছে না, তা কিনা এই যুবকটি পারবে!—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তবু যুবককে একটা সুযোগ দিতে দোষ কি? —এই ভেবে তিনি যন্ত্রে হাত লাগাতে অনুমতি দিলেন এডিসনকে।

এডিসন তখনই যন্ত্রটি মেরামতির কাজে হাত লাগালেন। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেটিকে সারিয়ে ফেললেন।

কোম্পানীর ডিরেক্টর সাহেব তো অবাক!

যুবকটি কি জাদু জানে?

তখনই ডিরেক্টর সাহেব এডিসনকে একটা চাকরি দিলেন। কোম্পানীর মেশিনগুলি তত্ত্বাবধানের কাজ। বেতন—মাসিক তিনশো ডলার। বাইশ বছরের এক যুবকের পক্ষে এতো বেতন পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়!

এডিসন তাঁর বেতনের টাকা থেকে মাসে মাসে অল্প ক'রে বন্ধুদের ঋণ শোধ করতে লাগলেন। কিছুকালের মধ্যেই সব ঋণ শোধ হয়ে গেলো। বন্ধুরা খুশী হলেন। ঋণমুক্ত হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন এডিসন।

নিউইয়র্কে যে প্রতিষ্ঠানে এডিসন চাকরি পেলেন তার নাম 'গোল্ড ইণ্ডিকেটার কোম্পানী'। এডিসনের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে উৎসাহ দেবার জন্যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ দু'জন সহকারী গবেষক নিযুক্ত করলেন। আর এডিসন ঐ সহকারীদের সহায়তায় নিবিষ্ট চিত্তে নিত্য নূতন অভিনব যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের কাজে মন দিলেন।

১৮৬৯ সালে এডিসন 'ভোট রেকর্ডার' নামে এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করলেন।

পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটের জোরে আইন পাশ

হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট পড়ে। সদস্য সংখ্যা বেশী হ'লে ভোট গণনা করতে অনেক সময় লাগে। এডিসনের 'ভোট রেকর্ডার' যন্ত্র ভোট গণনার সময়টুকু বাঁচিয়ে দিতে পারবে।

১৮৬৯ সালের ১লা জুন তারিখে এডিসন তাঁর ভোট রেকর্ডার যন্ত্রের পেটেন্ট নিলেন। পেটেন্ট নম্বরটা ছিল ৯০,৬৪৮। অনেক আশা ছিল এডিসনের—সরকার এই যন্ত্রটি কিনবেন। তিনিও যন্ত্রটি বেচে প্রচুর অর্থ লাভ করবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণ হলো না। সরকার 'ভোট রেকর্ডার' যন্ত্র কিনলেন না।

এডিসন তাতে নিরাশ হলেন এবং তখনই মন স্থির ক'রে ফেললেন যে—ভবিষ্যতে এমন সব যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করবেন যা সাধারণ মানুষের খুবই প্রয়োজনে লাগবে। তাহ'লে জিনিসটা ভাল বিক্রী হবে এবং তাঁকে এভাবে আর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না।

বাজারে সোনার দাম প্রতিদিন ওঠানামা করে। সোনার দরের এই পরিবর্তন আপনা আপনি নির্দেশ করতে পারে, এমন একটি যন্ত্রের উন্নত সংস্করণ এডিসন শীঘ্রই আবিষ্কার করে ফেললেন। যন্ত্রটির নাম দিলেন স্টক-টিকার (Stock-ticker)।

এ খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই 'গোল্ড অ্যাণ্ড স্টক এক্সচেঞ্জ টেলিগ্রাফ কোম্পানী'র ম্যানেজার এডিসনকে ডেকে পাঠালেন।

সেটা ১৮৭০ সাল।

ম্যানেজার সাহেব বললেন: মিষ্টার এডিসন, আপনার 'স্টক-টিকার' যন্ত্র আমরা কিনতে চাই। কতো দাম চান আপনি?

এডিসন এ প্রশ্নের জবাব দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু মনে মনে চাইছিলেন চার হাজার ডলার পেতে। মুখ ফুটে মনের কথাটা বলতেও সাহস হচ্ছিল না, পাছে কোম্পানীর ম্যানেজার সাহেব এই চড়া দর শুনে পিছিয়ে যান,—না কেনেন তাঁর যন্ত্র!

যাইহোক, দামের কথা বলতে ইতস্ততঃ করছেন দেখে ম্যানেজার

সাহেব নিজেই প্রস্তাব দিলেন, "চল্লিশ হাজার ডলার পেলে আপনি খুশী হবেন, মিষ্টার এডিসন?" —এডিসন তো এতো পাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন নি। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এ দামটা মন্দ নয়।"

তাই হলো। স্টক-টিকার যন্ত্র বেচে এডিসন চল্লিশ হাজার ডলার পেলেন। আর সেই টাকা দিয়ে নিউজার্সির নিউ আর্কে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও উৎপাদনের একটা কারখানা বানালেন। অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করলেন সেখানে। তাতেই সব টাকাটা খরচ হ'য়ে গেলো।

কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন এডিসন। নিজের কারখানা সংলগ্ন বীক্ষণাগারে বসে তিনি নিত্য নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করতেন। আর কারখানার দক্ষ কারিগরেরা সেই সব যন্ত্র বানাতেন।

১৮৭০ থেকে ১৮৭৬—এই ক'বছরের মধ্যে এডিসন মোট ১২২টি যন্ত্র উদ্ভাবন করে তার 'পেটেন্ট' নেন। পেটেন্ট নেওয়া জিনিসের মালিকানা স্বত্ব উদ্ভাবকের থাকে। অপরে উদ্ভাবকের বিনা অনুমতিতে সেই জিনিস নকল করে বানালে আইন অনুসারে দণ্ড পায়। কাজেই পেটেন্ট নেওয়া থাকলে আবিষ্কর্তার মালিকানা বা স্বত্ব আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

ভাবতে অবাক লাগে যে, যে এডিসনকে স্কুলের মাষ্টার মশাই বোকা আখ্যা দিয়া পড়াতে চাননি, সেই এডিসনই মাত্র তিরিশ বছর বয়সে ১২২টি যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে তার পেটেন্ট নিয়েছিলেন এবং তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে। শুধু তাই নয়--নিজের চেষ্টায় তিনি ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শিখে নিয়েছিলেন। ফলে ঐ দুই ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের অনেক বই ও পত্রপত্রিকা পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন তা তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার সহায়ক হয়েছিল।

১৮৭১ সাল এডিসনের জীবনে একটি স্মরণীয় বছর। এ বছর এডিসন তাঁর মাকে হারালেন। আবার বিয়েও করলেন এই বছরেই। স্ত্রীর নাম মেরী স্টিলওয়েল।

একটি পুত্র এবং কন্যা সন্তানের জনক হলেন এডিসন। মেয়ে 'মেরিয়ন'কে তিনি ডাকতেন 'ডট্' বলে আর ছেলে 'টমাস আলভা এডিসন জুনিয়ার'কে ডাকতেন 'ড্যাশ' বলে। টেলিগ্রাফিতে স্যামুয়েল মোর্স কর্তৃক আবিষ্কৃত 'ডট্' ও 'ড্যাশ' চিহ্ন দ্বারা বার্তা পাঠানো হয়। টেলিগ্রাফিকে এডিসন বড় ভালবাসতেন। নিজেও ছিলেন খুব ভাল টেলিগ্রাফ অপারেটর। নিজের ছেলেমেয়েদের 'ডট্' ও 'ড্যাশ' নাম দিয়ে তিনি তাঁর টেলিগ্রাফ প্রীতিকেই স্মরণীয় করে রাখেন।

এডিসনের প্রথমা স্ত্রী তিনটি সন্তান রেখে মারা যান ১৮৮৪ সালে। এর দু'বছর পর এডিসন বিয়ে করেন 'মিনা মিলার'কে। মিনা মিলারেরও তিনটি সন্তান—মেডিলিন, চার্লস ও থিওডোর। সর্বসাকুল্যে এডিসন ছিলেন ছয়টি সন্তানের জনক।

১৮৭৬ সালে এডিসন ঠিক করলেন যে, এবার তিনি পুরোপুরি উদ্ভাবনার কাজেই লেগে থাকবেন। এই ভেবে নিউ আর্কের কারখানা ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন নিউ জার্সির 'মেন্‌লো পার্ক' নামে শান্ত এক শহরে। সেখানে তিনি তৈরি করলেন বাড়ী এবং জমকালো এক বীক্ষণাগার। শহরের কলকোলাহল থেকে দূরে এই শান্ত পরিবেশে এসে এডিসন পরম শান্তি পেলেন। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য সাধনায় মগ্ন হলেন। সে সাধনা হলো মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার জন্যে নব নব যন্ত্র আবিষ্কার।

'নিক্' নামে একটি ছেলেকে মেনলো পার্কের বীক্ষণাগারের দ্বাররক্ষীর কাজে নিযুক্ত করা হলো। তাকে বলে দেওয়া হলো যে—অপরিচিত কোন লোককে অনুমতিপত্র বিনা গেটের ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

'নিক্' কাজে নিযুক্ত হলো বটে কিন্তু মালিক এডিসনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো না। প্রথম দিন যখন সে গেট পাহারা দিচ্ছিল তখন অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাক পরা একটি লোক এসে গেটের

গোড়ায় দাঁড়ালো। তারপর নিক্-এর বিনা অনুমতিতেই গেটের ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকতে গেলো।

'নিক্' তখনই লোকটিকে বাধা দিয়ে বললো : কি চাই আপনার ?

লোকটি বললো : আমি ভেতরে ঢুকতে চাই। গেট খুলে দাও।

—ভেতরে ঢুকতে হ'লে অনুমতিপত্র চাই। আপনার কাছে অনুমতিপত্র আছে কি ?

— না, তা নেই। তবে আমিই হচ্ছি এই কারখানার মালিক— টমাস আলভা এডিসন।

—বাঃ, বেশ সুন্দর বানানো গল্প বলতে পারেন তো আপনি। —এই বলে অবিশ্বাসের হাসি হেসে 'নিক্' গেট না খুলেই একটু দূরে সরে গেলো।

লোকটি অগত্যা গেটে যে 'কলিং বেল' লাগানো ছিল তার সুইচ ঘন ঘন টিপতে লাগলো।

ঘণ্টাধ্বনি শুনে কারখানার এক কর্মী ছুটে এলো গেটে। এসে দেখে, তাদেরই মালিক স্বয়ং এডিসন গেটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। গেটে তালা লাগানো। আর দ্বাররক্ষী 'নিক্' নিশ্চিন্তে অন্যকাজে রত।

কর্মচারীটি তখনই গেটের তালা খুলে দিয়ে নিক্‌কে বকতে লাগলো। এডিসন কিন্তু নিক্‌কে বকতে নিষেধ করলেন। বললেন, "ছেলেটির কর্তব্যবোধ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। যোগ্য লোককেই দ্বাররক্ষীর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।"

—তখন থেকেই 'নিক্' এডিসনের নেকনজরে পড়লো। তাকে দায়িত্বপূর্ণ অনেক কাজের ভার দিতে লাগলেন এডিসন। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি বীক্ষণাগারে কাজ করতেন। তখন বাড়ীর থেকে বীক্ষণাগারে তাঁর খাবার আনতো 'নিক্'। বীক্ষণাগারে এডিসনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও নজর রাখতো সে। এডিসন নিজেই স্বীকার করে গেছেন যে নিক্-এর মতো বিশ্বস্ত কর্মচারী ও সহচর বিরল।

পাঁচ

শব্দকে কৌশলে যন্ত্রের মধ্যে ধরে রাখা এবং প্রয়োজনমতো সেই শব্দকে যন্ত্র থেকে পুনরুদ্ধার করার এক অভিনব পরিকল্পনা মাথায় আসে এডিসনের।—এ পরিকল্পনাটি পুরনো অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের। কিন্তু মেনলো পার্কে এসে ১৮৭৭ সালে তার বাস্তব রূপ দেওয়ার কাজে লাগলেন এডিসন।

একদিন মেনলো পার্কের বীক্ষণাগারে বসে এডিসন তাঁর কল্পিত যন্ত্রটির নক্সা কাগজের ওপর এঁকে ফেললেন। তারপর বীক্ষণাগারের সেরা কারিগর 'জন ক্রেউসি'কে সেই নক্সাটি দিয়ে যন্ত্রটি বানাতে বললেন।

জন ক্রেউসির কারিগরি দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সে মাত্র তিরিশ ঘণ্টা খেটে যন্ত্রটি বানিয়ে ফেললো। এডিসনের সামনে যন্ত্রটি রেখে সে শুধালো: "এটা কি কাজে লাগবে স্যার?"

এডিসন হেসে বললেন, "এ যন্ত্র কথা বলবে"!—এ কথা শুনে জন ক্রেউসি খুব হাসতে লাগলো। এডিসন বুঝলেন—এ হচ্ছে অবিশ্বাসের হাসি। সত্যিই তো, সে যুগে এমন কথা শুনলে কেই বা

বিশ্বাস করতো বলো।

অভিনব এই যন্ত্রটির চেহারা কেমন, তা বলে রাখি।— এতে ছিল একটি ধাতব সিলিণ্ডার। তার ভেতরে ছিল অক্ষদণ্ড। অক্ষদণ্ডের গায়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত স্ক্রুর মতো প্যাঁচানো খাঁজ কাটা ছিল।

এডিসন সেই সিলিণ্ডারটির গায়ে টিনের একটি পাতলা পাত জড়িয়ে দিলেন। তারপর অক্ষদণ্ডের সঙ্গে লাগানো হাতলটিকে ঘোরাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিলিণ্ডারটিও এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরে যেতে লাগলো। ইস্পাতের একটি কাঁটা এডিসন এমন-ভাবে যন্ত্রের মধ্যে আটকালেন, যাতে ক'রে কাঁটাটির এক প্রান্ত সিলিণ্ডারের খাঁজ বরাবর টিনের পাতের ওপর চেপে লেগে থাকে। এবং অপর প্রান্ত মাউথ পিস-এর পাতলা পর্দার সঙ্গে আটকানো থাকে।

যন্ত্রটি ঠিকমতো সাজিয়ে নিয়ে এডিসন হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে মাউথ পিস্-এর সামনে মুখ রেখে আবৃত্তি করতে লাগলেন :

"Mary had a little lamb,
I'ts fleece was white as snow."

আবৃত্তি শেষ হ'লে পর শব্দের পুনরাবৃত্তি শোনার উদ্দেশ্যে যন্ত্রটি আবার ঠিক ক'রে নিয়ে আগের মতো হাতল ঘোরাতে লাগলেন এডিসন।—এবার তাঁর ঐ আগের কথাগুলোই আবার শোনা গেলো। শব্দ কিছু অস্পষ্টভাবে শোনা গেলেও ঘটলো এক চমকপ্রদ ঘটনা। কারণ, এই প্রথম যন্ত্রে মানুষের কণ্ঠস্বরের পুনরাবৃত্তি ঘটলো!

কারিগর জন ক্রাউসি এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে পড়লো। মুখ দিয়ে তার কথাটি সরলো না।—এডিসন এ যন্ত্রের নাম রাখলেন 'ফনোগ্রাফ'। ফনোগ্রাফ যন্ত্রে শব্দ কম্পনের রেকর্ড তৈরি হলো এবং শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটলো।— এই ফনোগ্রাফই

আধুনিক 'গ্রামোফোন' যন্ত্রের পূর্বপুরুষ।

১৮৭৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এডিসন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে ফনোগ্রাফ যন্ত্রের পেটেন্ট লাভ করলেন। পরের দিন প্রত্যূষে খবরের কাগজ মারফৎ বিশ্ববাসী এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের খবর জানতে পারলো। আর টমাস আলভা এডিসন রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে গেলেন।

আমেরিকার বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে 'ফনোগ্রাফ' কণ্ঠস্বরের পুনরাবৃত্তি শুনে অগণিত শ্রোতা মুগ্ধ হলেন।

'হোয়াইট হাউস' থেকে ডাক এলো এডিসনের। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট ফনোগ্রাফ যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ ক'রে এডিসনের উদ্ভাবনী প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

সেকালে আলোর জন্যে মানুষ ঘরে ঘরে ব্যবহার করতো মোমবাতি ও তেলের প্রদীপ।

এডিসন ভাবতে লাগলেন, এমন বাতি তৈরি করা যায় না কি, যা থেকে ধোঁয়া বেরুবে না, গন্ধ বেরুবে না, অথচ বেশ জোরালো আলো পাওয়া যাবে। এ কাজে তিনি বিদ্যুৎকে কাজে লাগাবেন বলে স্থির করলেন।

সেটা ১৮৭৮ সালের মার্চ মাস।

মেনলো পার্কের বীক্ষণাগারে বিজলী বাতি উদ্ভাবনের সাধনায় মগ্ন হলেন এডিসন। এডিসন জানতেন যে বৈদ্যুতিক রোধ থেকেই সৃষ্টি হয় আলো। আবার এ থেকে তাপও সৃষ্টি হয়। কাজেই রোধকে এমন সাবধানে রাখতে হবে, যাতে রোধের তার না পুড়ে যায়।

এই ভেবে এডিসন খুব সরু তারের একটি কুণ্ডলী বা ফিলামেণ্ট তৈরি করলেন। সরু তারের রোধ হয় বেশী। বিদ্যুৎ চালনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিলামেণ্ট জ্বলতে থাকে, ছড়াতে থাকে উজ্জ্বল আলো।

কিন্তু এ আলো বেশীক্ষণ পাওয়া গেলো না। একটু বাদেই ফিলামেণ্ট গরম হ'য়ে ছিঁড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আলোও গেলো নিভে।

ফিলামেণ্ট তৈরির উপযুক্ত জিনিস খুঁজে পাওয়ার জন্যে নিত্য-নূতন পদার্থ নিয়ে এডিসন তখন পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। নানা ধাতুর তার, বাঁশের তন্তু, মানুষের মাথার চুল, কাগজ, তুলোর সুতো—কোন কিছু নিয়েই পরীক্ষা করতে বাকি রাখলেন না।

এই সময় এক বন্ধু ঠাট্টার ছলে তাঁকে একদিন বললেন, "এডিসন, তুমি তো হাজার খানেক পরীক্ষা ক'রেও বিজলী বাতি আবিষ্কার করতে পারলে না। তোমার লজ্জা হয় না।"

উত্তরে এডিসন কি বলেছিলেন জান ?

বলেছিলেন, "কিন্তু ভাই, আমি তো হাজারটি এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি যাতে বিদ্যুৎ হতে আলো পাওয়া যায় না। সেটা কি আমার কৃতিত্ব নয় ?—তবে আমার লজ্জা হবে কেন ?"

যেমন প্রশ্ন, তেমনি জবাব।

বন্ধুটি জবাব শুনে চুপ করে গেলেন।

রবার্ট ব্রুসের মতো এডিসনের ধৈর্য ছিল অপরিসীম। বার বার অকৃতকার্য হলেও তিনি নিরাশ হতেন না। নতুন উদ্যমে আবার পরীক্ষা চালাতেন। এইটাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আর সাফল্যের চাবিকাঠি।

যাই হোক্, ফিলামেণ্ট যাতে তাড়াতাড়ি পুড়ে ছিঁড়ে না যায় সেজন্যে এডিসন স্থির করলেন যে এবার থেকে বায়ুশূন্য স্থানে ফিলামেণ্ট জ্বালাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কাচের একটা গোলাকার বাল্ব তৈরি করলেন। তার মধ্যে রাখলেন প্লাটিনামের তৈরি সরু তারকুণ্ডলী বা ফিলামেণ্ট। কাচের বাল্ব থেকে পাম্প ক'রে বাতাস বের ক'রে নিলেন। তারপর বর্তনীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফিলামেণ্ট উজ্জ্বল নিষ্পন্দ আলোক ছড়াতে লাগলো।

আট মিনিট জ্বলার পর প্লাটিনামের ফিলামেণ্ট গেলো ছিঁড়ে।

শেষে এডিসন মনে করলেন যে, কার্বনই হয়তো ফিলামেণ্টরূপে ভাল কাজ দেবে। এই ভেবে তিনি সুতোকে চুল্লীর মধ্যে রেখে সাবধানে অঙ্গার অর্থাৎ কার্বনে পরিণত করলেন। তারপর সেই অঙ্গারীভূত সুতো দিয়ে অতি কষ্টে ফিলামেণ্ট বানিয়ে বায়ুশূন্য বাল্বের মধ্যে রেখে পরীক্ষা করলেন।—এই বৈদ্যুতিক বাল্ব একটানা পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা ধরে জ্বললো। এডিসন বুঝলেন, এবার তিনি সাফল্যের শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছেন। খুঁজে পেয়েছেন—মোটামুটি চলনসই একটা ফিলামেণ্ট।

এবার মেনলো পার্কের কারখানায় দক্ষ কারিগরদের দিয়ে এডিসন কার্বন ফিলামেণ্টযুক্ত অনেক বৈদ্যুতিক বাল্ব তৈরি করালেন। তারপর 'মার্সেল ফক্স' নামে এক সাংবাদিক বন্ধুকে ডেকে আনলেন মেনলো পার্কে। বৈদ্যুতিক বাল্বের কার্যকারিতা দেখালেন তাঁকে। সেই সাংবাদিক বন্ধু এডিসনের এই অভিনব আবিষ্কার প্রত্যক্ষ ক'রে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে তখনই 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন। লিখলেন :—

পৃথিবীর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার—বৈদ্যুতিক আলোর জন্ম। কাচের বাল্ব থেকে নির্গত বৈদ্যুতিক আলো রাতকে দিনের মতো আলোকিত করছে।—এ আবিষ্কারের কৃতিত্ব মেনলো পার্কের টমাস আলভা এডিসনের।

নিউইয়র্ক হেরাল্ডে এই শিরোনামায় সংবাদ যেদিন বেরুলো, সেদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। কেউ এ সংবাদ বিশ্বাস করলো, আবার কেউ বললো, 'এ স্রেফ ধাপ্পা'।

এডিসন কিন্তু আপন আবিষ্কারকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে ১৮৮০ সালের নববর্ষ উপলক্ষে মেনলো পার্কে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সেই উৎসবে

দেখানো হবে 'বৈদ্যুতিক আলো'। যে কেউ ইচ্ছা করলে এই উৎসবে যোগ দিতে পারবেন।

নিউইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়া থেকে মেনলো পার্কে আসার জন্যে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হলো। তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করলেন এডিসন।

উৎসব শুরু হলো।

কাতারে কাতারে লোক আসতে লাগলো মেনলো পার্কে। কেউ এলো গোরুর গাড়ী করে, কেউ এলো ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে। আবার কেউ কেউ এলো ট্রেনে চেপে। এডিসন কি দেখাতে চান তা প্রত্যক্ষ করার জন্যে কৌতূহল সবার মনে।

সব লোক এসে গেলো।

সন্ধ্যা হলো।

এডিসন তখন টিপলেন 'সুইচ'।

মেনলো পার্কের সমস্ত জায়গা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। শত শত বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলে উঠে রাতকে দিনের মতো আলোকিত ক'রে তুললো। গাছের ফাঁকে ও ঘরবাড়ীর ওপরে যখন বৈদ্যুতিক বাল্বগুলি আলো ছড়াতে লাগলো, তখন জনতা বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে আনন্দে চীৎকার করতে লাগলো। এমন জিনিস তারা এর আগে চোখে তো দেখেই নি, কল্পনাও করতে পারে নি। নিউইয়র্ক হেরাল্ডে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা যে অতিশয়োক্তি নয়—এবার সবাই সেটা বুঝলো। নববর্ষের দিন মেনলো পার্কের বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা দেখে মোহিত হ'য়ে দর্শকেরা যে যার ঘরে ফিরে গেলো। আর তখন থেকেই এডিসন পরিচিত হলেন 'মেনলো পার্কের জাদুকর' নামে। জাদুকর না হ'লে এমন অসম্ভবকে কি কেউ আর সম্ভব করতে পারে!

এক লেখক তো এডিসনের এই আবিষ্কারকে নিয়ে রীতিমত একটা

গল্পই লিখে ফেললেন। তিনি লিখলেন : মেনলো পার্কের জাদুকর প্রতি সন্ধ্যায় বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালিয়ে তা বেলুনের সাহায্যে আকাশে উড়িয়ে দেন। আর সেইটাই সন্ধ্যাতারা রূপে আকাশে বিচরণ করে।

সাধারণ মানুষ অনেকেই কথাটা বিশ্বাস ক'রে এডিসনকে এ সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন ক'রে চিঠি লিখতে লাগলেন। কেউ কেউ বা সন্ধ্যাতারাকে 'এডিসন নক্ষত্র' নামেও অভিহিত ক'রে ফেললেন। —এডিসন অবশ্য ঐ অলীক কাহিনীর কথা অস্বীকার করলেন। বললেন, 'এ সব বানানো গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়'।

—এমনিভাবে টমাস আলভা এডিসনের আবিষ্কার পৃথিবী থেকে প্রদীপ ও মোমবাতির আলোর যুগের অবসান ঘটালো। সূচনা করলো—বৈদ্যুতিক আলোর যুগের।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ইতিহাসে এটাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। তাই এডিসনকে বলা হয় 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কর্তা'।— সত্যিই তাই। বৈদ্যুতিক আলো মানব সভ্যতাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে। পৃথিবী হতে অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটিয়েছে এই বৈদ্যুতিক আলো। শহর তো বটেই, গ্রামেরও ঘরে ঘরে আজ বৈদ্যুতিক বাতি। গ্যাসের আলোর পরিবর্তে রাস্তায় জ্বলে বৈদ্যুতিক বাতি। কলকারখানা, অপিস, কাছারি—কোথায় নেই বৈদ্যুতিক আলো?

পৃথিবীর মানুষকে এই ভাবে অন্ধকার হ'তে আলোর যুগে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব টমাস আলভা এডিসনের— মেনলো পার্কের জাদুকরের।

॥ ছয় ॥

বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হলেন না এডিসন। নিজের ধনসম্পদ উজাড় করে দিয়ে নিউইয়র্ক শহরের মাঝখানে পার্ল স্ট্রীটে জমি কিনে গড়ে তুললেন এক বিরাট কারখানা। সেখানে বসালেন বড় বড় ছ'টো জেনারেটর। মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে দিয়ে তার টেনে নিয়ে গিয়ে পঁচাশিটা বাড়ীতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন।

১৮৮২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে পার্ল স্ট্রীটের কারখানা থেকে একটা সুইচ টিপে এডিসন ২৩০০টি বৈদ্যুতিক বাল্ব থেকে ভাস্বর আলো ছড়িয়ে দিলেন নিউইয়র্ক শহরে। এ শহরে সেই দিনই সূচনা হলো বৈদ্যুতিক বাতির যুগের।—এমনিভাবে এডিসন মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ক'রে বাতি জ্বালাবার বাস্তব পদ্ধতি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিলেন।

শুধু বিজলী বাতিই নয়। রেলপথে চালাবার উপযোগী একটি ইলেকট্রিক ইঞ্জিনও আবিষ্কার ক'রে ফেললেন এডিসন। বারো অশ্ব শক্তি সম্পন্ন ছোট্ট ইলেকট্রিক ইঞ্জিনটি রেল লাইনের ওপর দিয়ে

তিনটি কামরা অনায়াসে টেনে নিয়ে যেতে পারতো।

মেনলো পার্কের চত্বরে ১৮৮০ সালের ১৩ই মে তারিখে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালিত ট্রেনটি পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হয়। ট্রেনটি সাফল্যের সঙ্গে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটতে সক্ষম হয়।

প্রথম পরীক্ষায় সাফল্য আসায় এডিসন মেনলো পার্কেই তিন মাইল লম্বা একটি রেলপথ স্থাপন করেন। নব্ব্ইজন যাত্রী এবং তাঁদের মালপত্র নিয়ে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ীটি ১৮৮২ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হলো।—সে পরীক্ষাতেও এলো সাফল্য।

এর ফলে এডিসনের বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন পেলো স্বীকৃতি। নিউইয়র্ক রেলপথে সেই থেকে আজও এডিসন আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হচ্ছে।

আবিষ্কারের কোন পরিকল্পনা মাথায় এলেই এডিসন সঙ্গে সঙ্গে তা একটা নোট বইতে লিখে ফেলতেন। আর নোট বইটা সব সময় নিজের পকেটে রাখতেন। মাঝে মাঝে ফাঁক পেলেই নোট বইয়ের লেখাগুলি পড়ে দেখতেন।

একদিন এমনিভাবে নোট বইয়ের লেখাগুলি পড়তে পড়তে এডিসনের মনে হলো—চলন্ত বস্তুর ছবি তোলার উপযোগী একটা ক্যামেরা বানাবেন।

তখন সেলুলয়েডের রোল ফটোগ্রাফিক ফিল্ম তৈরি হয়ে গেছে। তাতে এডিসনের কাজের খুব সুবিধা হলো। পরিকল্পনামতো 'মোশান পিকচার ক্যামেরা' তিনি শীঘ্রই আবিষ্কার ক'রে ফেললেন এবং ১৮৯১ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে সেই আবিষ্কারের পেটেণ্ট নিলেন। তারপর একটি প্রোজেক্টার তৈরির কাজে মন দিলেন। উদ্দেশ্য—সেই প্রোজেক্টার তাঁর ক্যামেরার ছবিগুলিকে সচল ভাবে পর্দার ওপরে ফেলবে। দর্শক পর্দার ওপর সেই সচল ছবিগুলিকে

দেখবে।

সেই বছরই এডিসন তাঁর প্রোজেক্টার যন্ত্র 'কাইনেটোস্কোপ' তৈরি ক'রে ফেললেন। তারপর 'ওয়েষ্ট-অরেঞ্জ' নামক স্থানে সচল ছবি দেখানোর প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করলেন।—কাঠের ঘর। সেইখানেই এডিসন শুরু করলেন সচল ছবি দেখানো। এক বিখ্যাত স্প্যানিশ নর্তকীর নাচ, কামারের কাজ, ঘোড়-দৌড়ের ছবি ইত্যাদি দেখিয়ে এডিসন জনসাধারণকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। বলতে গেলে তখনই গোড়াপত্তন হলো এ কালের সিনেমার।

আজ সিনেমা বিশ্বের সকল দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের চিত্ত-বিনোদনের একটি সেরা মাধ্যম। আর এটি মানব সমাজের সামনে উপস্থাপিত করার পেছনে টমাস আলভা এডিসনের অবদান অনেকখানি।

১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে আমেরিকাও জড়িয়ে পড়ে। সে সময় আমেরিকার বিজ্ঞানীরা নিত্য নূতন সমরাস্ত্র উদ্ভাবনে নিজেদের সকল শক্তি নিয়োজিত করেন। যুদ্ধ চলাকালে এডিসন একাই যুদ্ধের সহায়ক চল্লিশটি আবিষ্কারের কৃতিত্বের অধিকারী হন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটি, সেটি হলো একটি যন্ত্র, যা ডুবোজাহাজ ও টর্পেডোর সন্ধান দিতে পারে।—যুদ্ধের সময় এ যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। চল্লিশটি অতি প্রয়োজনীয় যুদ্ধকালীন আবিষ্কৃতির স্বীকৃতি স্বরূপ এডিসনকে 'পরম সেবা পদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সবাই জানে যে 'আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল' টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার করেন।—একথা সত্যি। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই যে সেই টেলিফোন যন্ত্রকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার কাজে বেলকে সাহায্য করেছিলেন এডিসন।

বেল-এর টেলিফোন যন্ত্রে কথা বলার ও কথা শোনার জন্যে একটি

মাত্র যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল। তাতে একই সঙ্গে কথা বলা ও কথা শোনার অসুবিধা হতো। এডিসন টেলিফোন যন্ত্রে কথা বলার জন্যে 'মাউথপিস্' এবং কথা শোনার জন্যে 'ইয়ার ফোন' সংযুক্ত করে তাকে আধুনিক রূপ দান করেন। ফলে আধুনিক টেলিফোন যন্ত্রে একই সঙ্গে কথা বলা ও কথা শোনা সম্ভবপর হয়।

সেকালে ঘোড়ায় টানা গাড়ীর চলন ছিল। ঘোড়ার গাড়ীর অসুবিধা অনেক। সবচেয়ে অসুবিধা—এ গাড়ী তেমন জোরে চলতে পারে না।

এডিসন অনেক দিন থেকেই ভাবছিলেন যে এমন একটা গাড়ী তিনি বানাবেন—যা যন্ত্রের সাহায্যে চলবে। সে গাড়ী টানার জন্যে ঘোড়ার দরকার হবে না।

এমন সময় একদিন এডিসনের সঙ্গে এক তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের আলাপ হলো। ভদ্রলোকের নাম 'হেনরী ফোর্ড'। ফোর্ড তখন সবেমাত্র 'মোটরগাড়ী' তৈরি করেছেন। তিনি এডিসনকে তাঁর আবিষ্কৃত যান্ত্রিক গাড়ীর বিবরণ দিলেন। বললেন: আমার গাড়ীতে পেট্রোল-ইঞ্জিন ব্যবহার করেছি। এতে বয়লার নেই। কাজেই স্টীম উৎপাদন করার জন্যে আগুন জ্বালানোরও ঝামেলা নেই। ধোঁয়াও খুব কম উৎপন্ন হয়। আমি ভাবছি, মোটরগাড়ীতে স্টোরেজ ব্যাটারি ব্যবহার করলে মন্দ হয় না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে স্টোরেজ ব্যাটারিগুলি বড্ড ভারী। হাল্‌কা ব্যাটারি পেলে কাজ হতো।

হেনরি ফোর্ডের পরিকল্পনাটি এডিসনের মনে ধরলো। তখন থেকেই এডিসন মোটর গাড়ীতে ব্যবহারের উপযোগী স্টোরেজ ব্যাটারি তৈরির গবেষণায় লিপ্ত হলেন। তারপর দীর্ঘ দশ বছর ধরে অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তৈরি করে ফেললেন মনোমত স্টোরেজ ব্যাটারি। ভাবতেও অবাক লাগে—কী অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় ছিল এই মানুষটির।

এডিসন আবিষ্কৃত স্টোরেজ ব্যাটারি এরপর থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত হতে লাগলো। যেসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ যায় নি সেখানে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাবার কাজেও এডিসনের স্টোরেজ ব্যাটারি ব্যবহৃত হতে লাগলো। রেলপথে সিগন্যাল-এর কাজে, এমনকি ডুবো জাহাজেও এই ব্যাটারির ব্যবহার শুরু হলো। নিজের কারখানায় তৈরি স্টোরেজ ব্যাটারি বিক্রী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেন এডিসন। আর প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই হেনরী ফোর্ড এডিসনের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হলেন। আমৃত্যু তাঁদের সে বন্ধুত্ব রইলো অটুট হয়ে।

১৮৭০ থেকে ১৯৩১—এই একষট্টি বছর সময়ের মধ্যে এডিসন এক হাজার একশো বাইশটি (১১২২) যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের পেটেণ্ট লাভ করেন। এতো বেশী সংখ্যক আবিষ্কারের কৃতিত্ব পৃথিবীতে এ যাবৎ কেউ লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ।

এডিসন বলতেন: 'আমি জীবনে এমন কিছু আবিষ্কার করব না, যা মানুষকে প্রাণে মারবে। আমার সকল আবিষ্কার হবে মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে, মানুষের জীবনকে আনন্দময় করার জন্যে, মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে।

সারা জীবনে আমি প্রায় দশ হাজার বই পড়েছি এবং প্রতিটি বইয়ের সারমর্ম আমার স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে আছে।'

সাত

১৯২৯ সালের ২১শে অক্টোবর।

সেটা এডিসনের বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের পর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার দিন।

মোটর গাড়ী উৎপাদনকারী ধনী ব্যবসায়ী এবং এডিসনের বিশিষ্ট বন্ধু হেনরি ফোর্ড ঐ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করলেন। তাঁর উদ্যোগে এই উপলক্ষে একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হলো। সেখানে এডিসন সম্পর্কিত যাবতীয় স্মারক দ্রব্য সযত্নে রাখা হলো।

সত্তর বছরেরও কিছু সময় আগে এডিসন 'সাপ্তাহিক হেরাল্ড' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তারই দু'টি পুরানো কপি রাখা হলো যাদুঘরে। যে টেলিগ্রাফ টেবিলে বসে এডিসন টেলিগ্রাফ অপারেটর রূপে কাজ করতেন, সেটিও রাখা হলো সেখানে। ১৮৮০ সালে মেনলো পার্কের বীক্ষণাগারে এডিসন যে ইলেকট্রিক রেল ইঞ্জিনের মডেলটি তৈরি করেছিলেন, সেটিও প্রদর্শিত হলো যাদুঘরে।

উৎসবের নির্দিষ্ট দিনটিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুভার, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে নিয়ে একটি পুরনো মডেলের রেলগাড়ী যাত্রা শুরু করলো পোর্ট হুরন থেকে। গন্তব্যস্থল ডেট্রইট।

বালক অবস্থায় এডিসন যে মডেলের ট্রেনে খবরের কাগজ ফেরি

করতেন, সেই মডেলেরই একটি পুরনো ট্রেনে চেপে ওঁরা রওনা হলেন। সেই ট্রেনেরই একটি কামরায় এডিসনের ব্যবহৃত ছাপাখানা এবং এডিসন যেমন রসায়নাগার বানিয়েছিলেন ট্রেনের কামরায়, তেমনি একটি রসায়নাগারও স্থাপন করা হলো।

সকলের অনুরোধে বৃদ্ধ এডিসন সেই ট্রেনে খবরের কাগজ ফেরির অভিনয় করতে রাজি হলেন। তাঁর বয়স তখন ৮২ বছর। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে সেই ছাপাখানায় বসে ১৮৬৩ সালের জুন মাসের সাপ্তাহিক হেরাল্ড পত্রিকার কয়েকটি কপি এডিসন নিজ হাতে কম্পোজ করে ছাপলেন। তারপর এ কামরা সে কামরায় গিয়ে হাসিমুখে যাত্রীদের মধ্যে খবরের কাগজ ও মিষ্টান্ন বিলি করলেন।

'আপনি কাজে অবসর নেবেন কবে থেকে ?'—এক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রশ্ন করলে এডিসন বললেন : 'আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আগের দিন অবসর নেব। বিজ্ঞানীদের জীবনে ছুটি বলে কিছু নেই। অতীতে শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানীরা তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজ করে গেছেন। আমিও তাই করছি। ভাবীকালের বিজ্ঞানীরাও তাই করবেন।'

ট্রেনটি চলতে চলতে অবশেষে এলো 'স্মিথ-ক্রিক' ষ্টেশনে। এখানে ট্রেন থামলো—এই সেই ষ্টেশন, যেখানে একদা এডিসনের স্বপ্নের পৃথিবী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এই ষ্টেশনেই ক্রুদ্ধ গার্ডসাহেব এডিসনের রসায়নাগারের জিনিসপত্তর কামরা থেকে টেনে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন।

ট্রেন থামতেই এডিসন নেমে পড়লেন প্লাটফরমে। বাল্যকালের সেই করুণ স্মৃতি বিজড়িত এই ষ্টেশনে নামতেই তাঁর মানসপটে ভেসে উঠলো সে দিনের দৃশ্যগুলি।—কামরায় আগুন, গার্ড সাহেবের তিরস্কার, প্লাটফরমে সাধের বীক্ষণাগারের যন্ত্রপাতি নিক্ষেপ! হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলেন এডিসন।

এমন সময় পিছন দিক থেকে কে যেন কনুই স্পর্শ করলেন। ফিরে তাকাতেই এডিসন দেখলেন যে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হার্বার্ট হুভার করমর্দনের জন্যে তাঁর দিকে নিজের হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন।—এডিসনও তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রেসিডেণ্টের দিকে। ওঁরা করমর্দন করলেন। আর প্লাটফরমে সমবেত জনতা উল্লাসে হাততালি দিয়ে ওঁদের অভিনন্দন জানালেন।

সেদিন সন্ধ্যায় এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এডিসনকে অভিনন্দন জানিয়ে যে সব বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সেই ভোজসভায় সেগুলি পাঠ করে শোনানো হলো। শোনানো হলো ইংলণ্ডের প্রিন্স অফ ওয়েলস, বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এবং বেতার যন্ত্রের আবিষ্কর্তা মার্কনির অভিনন্দন বার্তা।

—এডিসনের জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন।

সভার শেষে এডিসন উঠে দাঁড়ালেন সমবেত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে। কিন্তু পারলেন না। হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় বসে পড়লেন চেয়ারে।

প্রেসিডেণ্ট হুভারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক তখনই ছুটে এসে এডিসনকে পরীক্ষা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। সে ধাক্কা সামলে নিলেন এডিসন। কিন্তু এরপর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমাগত ভাঙতে লাগলো। ১৯৩১ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে জগদ্বিখ্যাত এই আবিষ্কর্তা ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। পশ্চাতে রেখে গেলেন অগণিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—যে সবের দৌলতে মানুষের জীবনে এসেছে সুখ ও সমৃদ্ধি।

সূর্যের মতো বিজলী বাতিও যতদিন পৃথিবীর বুক আলোকিত করবে, মানুষের স্মৃতিপটে টমাস আল্‌ভা এডিসনের নামও ততদিন অম্লান হয়ে থাকবে।